Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রসূল ﷺ এর জীবনি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা জাহান

রোলঃ 23090121357

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রসূল ﷺ এর জীবনি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা জাহান

রোলঃ 23090121357

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রসূল ﷺ এর জীবনি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসমা জাহান, আইডিঃ 23090121357 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রসূল ﷺ এর জীবনি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আসমা জাহান

(স্বাক্ষর)

আসমা জাহান

আইডিঃ 23090121357

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
হালীমার গৃহে রাসূল :- 6
নবুওয়াত প্রাপ্তিঃ 7
প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার:- 9
হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিবের ইসলাম গ্রহণ :- 10
সাওদা বিনতে যামআহ (রাঃ) এর সাথে রসূলের বিবাহঃ- 14
ইসরা ও মিরাজ :- 16
আকাবার দ্বিতীয় শপথ (বাইয়াতুল আকাবা আস সানিয়াহ):- 20
হিজরত:- 22
উম্ম মা'বাদের তাঁবুতে যাত্রাবিরতি:- 26
দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে মদীনায়:- 27
আইশা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহার সাথে বিয়ে :- 28
আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন:- 29
ঐতিহাসিক বদর :- 36
মুসলিম বাহিনীর প্রসুতি :- 37
রাসূল সাঃ এর দাফন:- 52

ভূমিকা

সীরাহ (সিরাহ, সিয়ার, বা সীরাত) বলতে একজন ব্যক্তির জীবনযাত্রা, জীবনী, বা জীবনবৃত্তান্তকে বোঝায়, যা তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সকল ঘটনা, আচরণ এবং বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। আরবিতে এর আক্ষরিক অর্থ 'পথ' বা 'যাত্রা'

নবীজির পিতৃবংশ ধারা :-

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে
হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহির ইবনে আলী ইবনে নযর ইবনে কিনানা ইবনে খুযায়মা ইবনে মুদ্রকা ইবনে ইয়াস ইবনে মুযর ইবনে নযর ইবনে মা'দ ইবনে আদনান । এ পর্যন্ত তার বংশ পরম্পরা সর্ব সম্মতিক্রমে স্বীকৃত। এর পর হতে হযরত আদম .আ. পর্যন্তের মধ্যে মতনৈক্য রয়েছে। এ কারণে তা পরিত্যাগ করা হল ।

নবীজির মাতৃ বংশ ধারা :

মুহাম্মাদ ইবনে আমেনা বিনতে ওহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহরা ইবনে কিলাব । সুতরাং বুঝা গেল যে, কিলাব ইবনে মুররা পর্যন্ত গেলে নবীজী সা. এর মাতা - পিতা উভয়ের বংশ ধারা মিলিত হয় ।

কুরাইশের আবির্ভাব :

ইয়েমেন থেকে যাযাবর গোত্র জুরহুম হিজাযে বসতি স্থাপন করে। তারা হিজাযে বসতি স্থাপন করেন হাজেরা আঃ এর শর্তমেনে জুরহুম গোএ মক্কার আশেপাশে বসতি স্থাপন করে। এলাকাটি মক্কা নামে পরিচিত লাভ করে। জুরহুম গোত্রের ভাষা আরবি ছিল। ইসমাঈল আঃ জুরহুম গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করেন। এখান থেকেই রসুল (সঃ) এর বংশধারা শুরু হয়।

সে সময় মক্কার রাজনৈতিক নেতৃত্ব জুরহুম গোত্রের হাতে ছিল। পরবর্তীতে ইবরাহিম আঃ এসে পুএ ইসমাঈলকে নিয়ে কাবাঘর নির্মাণ করেন।

রসুল (সাঃ) এর জন্ম :-

আমুল ফীল বা হস্তীবাহিনী নিয়ে আবরাহার অভিযানের ঘটনার বছর রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহন করেন।

হালীমার গৃহে রাসূল :-

আরবের প্রথা অনুসারে শিশুর জন্মের পর তাকে ধাত্রীর কাছে দেয়া হতো। । তেমনই রাসূল (সাঃ) এর জন্মের পর তাঁর জন্য ধাত্রী মায়ের সন্ধান লাগাতে বললেন তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব।

অবশেষে বনু সা'দ ইবনে বাকরের আবু যুয়াইবের কন্যা হালিমাকে ধাত্রী হিসেবে পাওয়া যায়।

রাসূল (সাঃ) হালীমার গৃহে অবস্থানের পর তার গৃহে বরকতের বারিধারা বইতে থাকে।

হালীমার গৃহে থাকাকালে একদিন শিশু মুহাম্মদ (সাঃ)তার দুধ- ভাইয়ের সাথে খেলা করছিলেন ।

তখন তাঁর দুধভাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মায়ের কাছে বলতে থাকেন আমি দেখলাম, দুইজন সাদা কাপড় পরা লোক মাটিতে নেমে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে শুইয়ে দিল এরপর বুক চিরে ফেললো তারপর হালিমা (রাঃ) তাঁর কাছে ছুটে যান এবং মুহাম্মদ (সাঃ) এর ভীতসন্ত্রস্ত মুখ দেখে তাকে জিজ্ঞেস করেন কী হয়েছে বাবা?তিনি বললেন দুইজন লোক এসে আমার বুক চিরে আমার

ভিতর থেকে কিছু একটা বের করে নিয়ে গেল।

হালীমা (রাঃ) মুহাম্মদ (সাঃ) কে খুব ভালোবাসতেন তাই এই ঘটনার পর সিদ্ধান্ত নেন মক্কায় মুহাম্মদ (সাঃ) এর মা আমিনা বিনতে ওয়াহাবের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। হালীমা রাঃ রাসুল সাঃ নিয়ে গেলেন আমিনা বিনতে ওয়াহাবের কাছে এবং রেখে আসলেন শিশু মুহাম্মদ কে তার মায়ের কাছে। রসুল (সাঃ) তার মায়ের সাথে মক্কায় যান এবং ছয় বছর বয়সে তাঁর মা মৃত্যুবরণ করেন।

দাদার তত্ত্বাবধায়নে রসূল:-

রসুল (সাঃ) এর মা আমিনা বিনতে ওয়াহাবের মৃত্যুর পর দাদা আবদুল মুত্তালিবের একক তত্ত্বাবধানে দুই বছর লালিত পালিত হন।

রসূল (সাঃ) এর আট বছর পূর্ন হলে আবদুল মুত্তালিব মারা যান আবদুল মুত্তালিব তাঁর পৌত্রকে খুব মুহাম্মদ কে খুব ভালোবাসতেন।

দাদা আবদুর মুওালিবের মৃত্যুর পর শিশু মুহাম্মদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন চাচা আবু তালিব। জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় চাচার তত্বাবধানে থাকেন তিনি।

পবিত্র বন্ধন

খাদিজা (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহার) সাথে বিবাহ:-

মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সাথে বিয়ে হওয়ার আগে খাদিজার আরো দুইবার বিবাহ হয় প্রথমবার খাদিজা (রাঃ)বিয়ে হয়েছিল বনু মাখযুমের সফল ব্যবসায়ী অতিক বিন আবিদের সাথে।

আতিক বিন আবিদ মারা যাওয়ার পর নাব্বাশ ইবনে যুবারা তামীমী সাথে

সাথে বিবাহ। নাব্বাশ ইবনে তামীমী ছিলেন মক্কার প্রসিদ্ধ দানবীর ও বীর যোদ্ধা নাব্বাশ ইবনে তামীমী মারা যাওয়ার পর খাদিজা পনেরো বছর তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন। মক্কার যোগ্য অনেকেই তাঁর সঙ্গী হওয়ার প্রস্তাব পাঠাতো কিন্তু তিনি গ্রহণ করতেন না নাব্বাশের মৃত্যুর পর শোকে খাদিজা স্তব্ধ হয়ে যান ধীরে ধীরে সামলে উঠেন তিনি।শক্ত হাতে হাল ধরেন মক্কায় স্বামীদের ব্যবসার। ধীরে ধীরে ব্যবসায়ী হিসেবে মক্কাতে সুপরিচিত হন।ব্যবসার সূত্রে রসূল (সাঃ) এর সাথে পরিচিয় হয় তাঁর। খাদিজা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহার ব্যাবসার কাজে খাদিজার গোলাম সহ শামের বাজারে যান। অবিশ্বাশ্য লাভ নিয়ে ফিরে আসেন খাদিজা (রাঃ) কাছে। রসূল (সাঃ) এর মধ্যে আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততা দেখে তিনি মুগ্ধ হন। তাঁর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব দেন এবং মক্কায় তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। রসূল ছিলেন তরুণ টগবগে যুবক আর খাদিজা ছিলেন বয়স ছিল চল্লিশের কৌঠায় কিন্তু তাদের ভালোবাসার কোনো কমতি ছিলনা।রসূল (সাঃ) খাদিজাকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন। খাদিজা বেঁচে থাকতে তিনি কাউকে বিবাহ করেননি। খাদিজা ছিলেন রাসুলের সকল সন্তানের মা।

নবুওয়াত প্রাপ্তিঃ

মুহাম্মদ (সাঃ) চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহর ইচ্ছায় নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। রসুল (সাঃ) হেরা পর্বতের গুহায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন।একদিন হেরা পর্বতের গুহায় থাকাকালীন জীবরাঈল (আঃ) নিজ রুপে ওয়াহী নিয়ে আসেন রসূল (সাঃ) এর কাছে।রসূল (সাঃ) এর কাছে এসে বললেন 'ইকরা' পড় মুহাম্মদ (সাঃ) বললেন আমি পড়তে জানিনা জীবরাঈল মুহাম্মদ (সাঃ) কে আবারও শক্ত করে বুকে জড়িয়ে চাপ দেন এর পর ছেড়ে দিয়ে বললেন 'ইক্করা' রসূল (সাঃ) আবারও বললেন আমি পড়তে জানিনা জীবরাঈল আবার তাঁকে বুকে জড়িয়ে চাপ দিলেন বললেন 'ইক্করা' এই ভাবে তিনবার বলার পর অবশেষে তিনি কুরআনের নাযিলকৃত প্রথম আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করেন। এগুলো ছিল সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত

- ১.اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ١
  - ২.خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ٢
  - ৩.اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ٣
  - 8.الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ٤
  - ৫.عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٥

এই আয়াতগুলোর অর্থ হলো:

১. পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।

৩. পাঠ করুন, আপনার রব সর্বোচ্চ দয়ালু।

৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।

- ৫.তিনি মানুষ কে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত ন।

এই ঘটনার পর রসুল (সাঃ) ভূতসন্ত্রস্ত হয়ে যান এবং ছুটে যান খাদিজা (রাঃ) কাছে বললেন আমাকে চাদর মুড়ে দাও তিনি শীতে কাঁপছিলেন খাদিজা তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন তারপর খাদিজাকে সব কথা খুলে বললেন খাদিজা (রাঃ) রসূল (সাঃ) কে বললেন
আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কখনো
পরিত্যাগ করবেন না কেননা আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে আপনি সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের চেষ্টা করেন । অসহায়দের আশ্রয় প্রধান করেন।মেহমানদের আদর যত্ন করেন, আতিথিদের আতিথেয়তা প্রদান করেন, ঋনগ্রস্তদের ঋনের দায় মোচনের সাহায্য করেন, যারা সত্যের পথে থাকেন তাদের
আপনি সাহায্য করেন,নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না।

এরপর খাদিজা (রাঃ) তাকে স্বীয় চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফাল এর কাছে নিয়ে গেলেন রসূল (সাঃ) কে।ওয়ারাকাহ ইবন নাওফাল এক আল্লাহে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে অনেক পড়াশুনা করেছেন। তার কাছে রসূল (সাঃ) হেরা পর্বতে রসূল সা জিব্রাঈল (আঃ) আগমের সব ঘটনা উল্লেখ করেন। রসূলের কথা শুনে ওয়ারাকাহ বিস্ময়ে বলেন, ইনিইতো সেই জিবরাঈল যিনি মূসা (আঃ) এর কাছে আগমন করেছিলেন। তারপর আবার বলেন, হায়!হায়!
আপনার স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয়
লোকেরা, আপনার উপর নানাভাবে
জুলুম ই অত্যাচার করবে এবং
আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে সেদিন যদি আমি শক্তিমান এবং যদি জীবিত থাকতাম।

ওয়ারাকার মুখ থেকে এসব কথা শুনে রসূল আবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, একী!ওরা আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে?

ওয়ারাকাহ বললেন হ্যাঁ, তারা আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে, শুধু আপনার কথাই নয়, অতীতে এ রকম বহু ঘটনা ঘটেছে। আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে সর্ব প্রকারে সাহায্য আপনাকে করবো, ওয়ারাকাহ ছিলেন। বৃদ্ধ, কিছু দিন পরই ওয়ারাকাহ মৃত্যু বরন করেন।

গোপনে দাওয়াত:-

আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়ে রসূল (সাঃ) ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন শুরুতে ইসলামের দাওয়াত ঘনিষ্ট আত্মীয়দের মাঝে

সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ইসলাম কবুল করেন।

প্রথম ইসলাম কবুলকারীগণঃ-

খাদিজা (রাঃ) ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সর্ব প্রথম। তিনি ছিলেন রসূলের প্রথম ভালোবাসা তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত রসূল (সাঃ) কে সাহায্য করে যান।ইসলাম গ্রহনকারী প্রথম দাস হলেন যাইদ ইবনে হারিসা ।ইসলালাম গ্রহণকারী প্রথম শিশু হলেন আলী ইবন আবি তালিব এবং ইসলাম গ্রহনকারী সর্বপ্রথম পুরুষ হলেন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এরপর ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার:-

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِين

আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর।(২১৪:২৬)

গোপনে ইসলাম প্রচারের কাজ চলে তিন বছর। সূরা শুআরা এই আয়াত নাযিলের পর মুহাম্মদ (সাঃ) প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের দাওয়াত দেয়ার অনুমতি পান আল্লাহর পক্ষ থেকে। রসূল (সাঃ) ও সাহাবাগণ সালাত পড়ার জন্য দুর্গম গিরিপথে চলে যেতেন, লোকজনের আড়ালে লুকিয়ে নামাজ পড়তেন একদিন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস সহ রাসূল (সাঃ) এর সাহাবিদের একটি ক্ষুদ্র দল মক্কার একটি পর্বত গুহায় নামায পড়ছেন মক্কার একটি মুশরিক দল এমন সময় সেখানে উপস্থিত হয় তারা মুমিনদের কঠোরভাবে নিন্দা ও গালিগালাজ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদেঁর হত্যা করতে উদ্যত হয়। সা'দ ইবনে আবু ওয়াকাস

এই সময় মরা- উটের চোয়ালের হাড় দিয়ে জোরে আঘাত হেনে মুশরিকদের একজনের মাথা ফাটিয়ে দেন। ইসলামের জন্য এটাই রক্তপাতের প্রথম ঘটনা।রসূল (সাঃ) আল্লাহর

মুতাবিক প্রকাশ্যে দাওয়াত দিলেও যতক্ষন তাদের দেব দেবীর নাম উল্লেখ বা সমালোচনা করেননি ততক্ষন । তারা তাঁর থেকে দূরে সরে যায়নি। কিংবা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মূখর হয়নি। কিন্তু যখন তিনি তাদের দেব দেবীর সমালোচনা করলেন তখনই তারা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচন্ড ক্ষেপে শত্রুতায় কোমর বেঁধে নামলো। ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ অপমান, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা, গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টার মতো জঘন্য কুচক্রের শিকার হন। কুরাইশ নেতারা আবু তালিবের কাছে এসে বললো আপনার ভাতিজা মুহাম্মাদ আমাদের দেব দেবীদের গালিগালাজ করছে আমাদের সভা সমাবেশে বাঁধা দিচ্ছে। তাঁকে, বলে দেবেন আমাদের ধারেকাছেও যেন না আসে। আবু তালিব ডেকে এনে বললেন লোকেরা তোমার নামে অভিযোগ এনেছে । তুমি নাকি তাদেরসভায় বাঁধা দিচ্ছো। তুমি কেন এসব করছে ?

রসূল (সাঃ) এর আকাশের দিকে

তাকিয়ে বললেন,

-চাচা, আপনি কি সূর্য দেখতে পাচ্ছেন?

- হ্যাঁ

এই সূর্যের তাপ থেকে আমাকে রক্ষা করতে আপনি যতোটা অপরাগ আমার এই দাওয়াতি কাজ থামিয়ে দিতেও আমি ততোটাই অপরাগ।। রসুল (সাঃ) বলেন, যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদ এনে দেয়, তবুও আমি এ কাজ থেকে বিরত থাকবোনা যতক্ষন না স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়ে ফয়সালা করে দেন অথবা আমার মৃত্যু হয়। আবু তালিব ভাতিজারকথা শুনে বললেন, ভাতিজা, তুমি সত্য বলছো। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

তুমি তোমার দাওয়াতি কাজচালু রাখো আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিবের ইসলাম গ্রহণ :-

হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব ছিলেন শিকারী। প্রায়ই মরুভূমিতে শিকারে বেরিয়ে পড়তেন। আবু জাহেল সবসময় রসূল (সাঃ) পিছনে লেগে থাকতেন। আবু জাহেলের আচরনের সীমা দিনদিন ছাড়িয়ে যায়। হামযা (রাঃ) শিকার ফিরে এক দাসির মুখে শুনলেন তাঁর ভাতিজা মুহাম্মাদকে আবু জাহেল অপমানিত করেছে এবং ইসলাম নিয়েও আজেবাজে কথা বলেছে। হামযা (রাঃ) কাফের ছিলেন কিন্তু মুহাম্মাদ তার ভাতিজা মুহাম্মাদের উপর আক্রমণ হামযা নিজের অপমান হিসেবে নিলেন। তিনি তখন দ্রুত আবু জাহেলের কাছে গেলেন এবং তাঁর যা হাতে থাকা ধনুক দিয়ে প্রচন্ড জোরে আঘাত করে বললেন তোমার কত বড় সাহস তুমি

আমারভাতিজা মুহাম্মাদকে আঘাত করো?শুনে রাখো, আমি মুহাম্মাদের ধর্ম অনুসরণ করছি সাহস থাকলে আমাকে মারো। - হামযা (রাঃ) জিদ করে বলেছে ফেলেছেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ কথা বলেছেন আবু জাহেলকে ক্ষেপানোর জন্য কিন্তু হঠাৎ তার হুশ হলো আরে! এটা আমি কী করলাম ইসলাম গ্রহণ করে ফেললাম! তিনি মুসলিম হবেন নাকিকাফের থেকে যাবেন সেটা নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন। তিনি সারারাত আল্লাহ কাছে দুআ করলেন, আল্লাহ যাতে তাকে সত্য পথ দেখায়। সকালে উঠেই, তিনি অনুভব করলেন তার অন্তর ইসলামের প্রতি ভালোবাসায় ভরে গেছে। প্রিয় চাচাকে পাশে পাওয়া ছিল রসূলের জীবনের অসাধারণ মূহুর্তের একটি।

উমার ইবন খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ:-

উমার ইবন খাত্তাব ছিলেন ইসলামের গোঁড় শত্রু, কট্টর ইসলামবিদ্বেষীএকজন মানুষ। একদিন উমার উন্মুক্ত তলোয়ারনহাতে চললেন দারুল আরকামে রসূল (সাঃ) কে হত্যা করার জন্য পথেই তার আত্মীয় নাঈমের সাথে দেখা তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

- কোথায় যাচ্ছো উমার

-মুহাম্মাদকে হত্যা করতে যাচ্ছি

-আগে তোমার নিজের বাড়ির খোঁজ নাও পরে মুহাম্মাদ হত্যা করো।

- কেন ? কি হয়েছে?

-খোঁজ নিয়ে দেখ তোমার আপন বোন ও ভগ্নিপতি মুসলিম হয়ে গিয়েছে।

উমার এ কথা শুনে তার বোনের বাড়িতে গেলেন ।

উমারের বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ হবন যায়িদ কে কুরআন

শিক্ষা দিছিলেন খাব্বাব ইবন আরাত।

তারা উমারকে দেখে কাগজটি লুকিয়ে

ফেললেন, উমার বললো অমি শুনলাম

তোমরা নাকি মুসলিম হয়ে গেছো?

এই কথা বলেই তিনি হঠাৎ সাঈদ কে আঘাত করলেন, ফাতিমাকেও মেরে রক্তাক্ত করলেন। উমার বোনের রক্ত দেখে অনুতপ্ত হলেন তারপর বললেন তোমরা যে কাগজটি পড়ছিলে সেটা আমাকে দাও

তারপর উমার (রঃ) নিজেকে

পরিষ্কার করে কাগজটি হাতে

নিলেন সেখানে সূরা ত্বহা লেখা

ছিল।

طه

২مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

৩إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ

৪تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى

৫الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

৬لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

৭وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ৮

১. ত্বা-হা।

২. আমরা আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ করিনি আপনার কষ্ট হওয়ার জন্য।

৩. কিন্তু যারা ভয় করে, তাদের জন্য উপদেশ হিসেবে।

৪. তিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কাছ থেকে এটি অবতীর্ণ করা হয়েছে।

৫. যিনি পরম করুণাময়, যিনি আরশের উপর সমুন্নত।

৬. যা কিছু আসমানসমূহে ও যমীনে এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী এবং ভূগর্ভে আছে, তার সবই তাঁর।

৭. যদি আপনি উচ্চস্বরেও কথা বলেন, তবে তিনি গোপন ও অতি গোপন বিষয়ও জানেন।

৮. তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তাঁরই সুন্দরতম নামসমূহ রয়েছে।

সূরা ত্বহার পড়ে উমার রসূল (সাঃ) এর কাছে যান এবং বলেন হে আল্লাহর রসূল আমি মুসলিম হতে এসেছি রসূল (সাঃ)বললেন 'আল্লাহু আকবার!
উমারের মুসলিম হওয়া ছিল বিজয়।

বয়কট :-

যখন কুরাইশরা আবিষ্কাকার করলো ইমানদারদের মধে কিছুলোক আবিসিনিয়া হিজরত করে সেখানে নিরাপদে আছে। কুরাইশরা তখন তারা বুঝতে পারলো মুহাম্মদকে মেরেফেলা ছাড়া আর কোনো সমাধান নেই

বনু হাশিম এবং বনু আল মুত্তালিবের সাথে সকল প্রকার লেনদেন বন্ধ করে দেয়। গোএ দুটো চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখে। এককথায়

বয়কট করা শুরু করে।কুরাইশরা নিশ্চিত করতে চায় যেন গোএ দুটোর কাছে কোনো খাবার না পৌঁছে। তারা কাবাঘরের ভিতরে বয়কট চুক্তির দলিল টাঙ্গিয়ে দেয়া মাক্কী জীবনের সপ্তম বছরের মুহাররাম মাসে বয়কট শুরু হয় তিন বছর বয়কট চলতে থাকে।

কুরাইশদের কাবাঘরের চুক্তির দলিল উইপোকা খেয়েফেলে আল্লাহর নাম ছাড়া সেখানে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না সূরা মুদ্দাসিরে আল্লাহ তায়ালা এটা উল্লেখ করেন।

“কেউ জানেনা আল্লাহর সৈনিকের ব্যাপারে কিন্তু একমাত্র তিনিই জানেন"

(সূরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪: ৩১)

বয়কট চলাকালীন বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিবের নারী পুরুষ শিশুরা

কষ্ট পেতে থাকে ক্ষুদার যন্ত্রনায় গছের পাতা খেয়ে বেঁচেছিল তিন বছর পর নানান নাটকীয়তার

সাথে বয়কট পরিসমপ্তি ঘটে।বয়কট :-

যখন কুরাইশরা আবিষ্কাকার করলো ইমানদারদের মধে কিছুলোক আবিসিনিয়া

হিজরত করে সেখানে নিরাপদে আছে।

কুরাইশরা তখন তারা বুঝতে পারলো মুহাম্মদকে মেরেফেলা ছাড়া আর কোনো সমাধান নেই বনু হাশিম এবং বনু আল মুত্তালিবের সাথে সকল প্রকার লেনদেন বন্ধ করে দেয়। গোএ দুটো চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখে। এককথায়

বয়কট করা শুরু করে।কুরাইশরা নিশ্চিত করতে চায় যেন গোএ দুটোর কাছে কোনো খাবার না পৌঁছে। তারা কাবাঘরের ভিতরে বয়কট চুক্তির দলিল টাঙ্গিয়ে দেয়া মাক্কী জীবনের সপ্তম বছরের মুহাররাম মাসে বয়কট শুরু হয় তিন বছর বয়কট চলতে থাকে।

কুরাইশদের কাবাঘরের চুক্তির দলিল উইপোকা খেয়েফেলে আল্লাহর নাম ছাড়া সেখানে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না সূরা মুদ্দাসিরে আল্লাহ তায়ালা এটা উল্লেখ করেন।

"কেউ জানেনা আল্লাহর সৈনিকের ব্যাপারে কিন্তু একমাত্র তিনিই জানেন"

(সূরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪: ৩১)

বয়কট চলাকালীন বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিবের নারী পুরুষ শিশুরা

কষ্ট পেতে থাকে ক্ষুদার যন্ত্রনায় গছের পাতা খেয়ে বেঁচেছিল তিন বছর পর নানান নাটকীয়তার সাথে বয়কট পরিসমপ্তি ঘটে।

আমুল হুযন:-

নবুওয়াতের দশম বছর রজব মাসে, আবু তালিব মারা যান। আবদুল মুত্তালিবের রেখে যাওয়া পৌত্রকে আবু তালিব জীবনের শেষ রক্ষা করে গেছেন। পিতার সমতূল্য চাচা ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারেননি চাচার মৃত্যুতে তিনি খুবই ব্যথিত হন এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই সূরা কাসাসের ৫৫ নং আয়াত নাযিল হয়

প্রিয় চাচার মৃত্যুর ২মাস পর নবুওয়াতের ১০ম বছর রমযান মাসের ১০ তারিখ রসূলের প্রানপ্রিয় স্ত্রী (রাঃ) মারা যায়। খাদিজা ছিল রসূলের মানসিক শান্তি। প্রিয়তমাকে হারিয়ে রসূল শোকাহত । দুইটি ঘটনার আকস্মীকতায়রসূল (সাঃ) ভেঙে পড়েন তাই নবুওয়াতের এই বছরটা গুরুত্বপূর্ণ ইসলামের ইতিহাসে এই বছরটা আমুল হুযন বা দুখের বছর নামে পরিচিত ।

সাওদা বিনতে যামআহ (রাঃ) এর সাথে রসূলের বিবাহঃ-

নবুওয়াতের ১০ম বছর শাওয়াল মাসে রসুল (সাঃ)বিবাহ করেন সাওদা বিনতে যামআহ কে। সাওদা স্বামী ছিলেন সাকরান বিন আমর।

আবিসিনিয়ায় সাকরান বিন আমর মৃত্যু্িবরণ করেন। সাওদা (রাঃ) ইদ্দত শেষে রসূলের সাথে বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন রসূলের ২য় স্ত্রী

তায়েফ:-

নবুওয়াতের ১০ম বছর শাওয়াল মাসে মক্কা থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত তায়েফ। ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর জন্য রসূল (সাঃ) সেখানে গমন করেন। রসূল (সাঃ) এর সাথে ছিলেন মায়েদ বিন হারিসা। তায়েফের সর্দার ছিলেন বনু সাকিফ গোত্রের তিন নেতা তাদের রসূল (সাঃ) ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন কিন্তু তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখান করে। তারা রসূল (সাঃ)কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে বিব্রত করার চেষ্টা করে। তায়েফে ছোট বড়, বৃদ্ধ প্রত্যেকে রসূলের সাথে ন্যাক্কারজনক আচরণ করে। রসূল (সাঃ) সেখানে ১০ দিন অবস্থান করেন। কেউ দাওয়াত গ্রহণ না করায় ভগ্ন হৃদয়ে তিনি মক্কায় ফিরে আসার প্রস্তুতি নিলেন কিন্তু পথিমধ্যে রসূলকে অপমান করার জন্য আবার কিশোর যুবকদের লেলিয়ে দেয়া হলো তারা পাথর মেরে রসূল (সাঃ) কে রক্তাত্ত করলো , ক্লান্ত আহত শরীর নিয়ে তায়েফথেকে ৩ মাইল দূরে একটি বাগানে প্রবেশ করেন।এবং একটি গাছের সাথে হেলান দিয়ে তিনি প্রচন্ড কষ্ট আর মনোবেদনা থেকে আল্লাহর কাছে হাত তুলে দুআ করলেন অত্যান্ত আবেগময় একটি দুআ।দুআ টি মুস্তাদআফিনের

দুআ নামে পরিচিত।

'হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আমার দুর্বলতা, অসহায়ত্ব এবং মানুষের কাছে আমার মূল্যহীনতা সম্পর্কে অভিযোগ করছি। দয়ালু দাতা, তুমি দুর্বলদের রব, তুমি আমারও রব, তুমি আমাকে কার কাছে ন্যস্ত করছ? আমাকে কি এমন কারও কাছে ন্যস্ত করছ, যে আমার সাথে রুক্ষ ব্যবহার করবে? নাকি কোনো শত্রুর হাতে ন্যস্ত করছ যাকে তুমি আমার বিষয়ের মালিক করে দিয়েছ? যদি তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হও তবে আমার কোনও দুঃখ নেই, আফসোসও নেই। তোমার ক্ষমাশীলতা আমার জন্য প্রশস্ত ও প্রসারিত কর। আমি তোমার ক্রোধ ও অভিশাপ থেকে তোমার সে আলোয় আশ্রয় চাই যা দ্বারা সকল অন্ধকার দূর হয়ে যায়। দুনিয়া এবং আখিরাতের সকল বিষয় তোমার হাতে ন্যস্ত। সকল ক্ষমতা এবং শক্তি শুধু তোমারই। তোমার শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই।'

এই দুআটি থেকে বুঝা যায়।তায়েফবাসী রসূল সাঃ এর সাথে কতটা দুব্যবহার করেছিল এবং তাদের ঈমান না আনার কারণেতিনি কতত ব্যথিত হয়েছেন ।রসূল (সাঃ)এর জীবনে তায়েফের
দিন ছিল সবচেয়ে বিষাদমাখা।
আইশা (রাঃ) একদিন জানতে চাইলেন 'ইয়াআল্লাহর রসূল উহুদের দিনের চাইতে মারাত্মককোনো দিন আপনি কি আপনার জীবনে দেখেছেন। রসূল (সাঃ) বললেন
'হ্যাঁ, দেখেছি। সেটি ছিল তাইফের দিন। আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা গ্রহণ করেনি। আমি সেদিন মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিপর্যস্ত। মাঝপথে এসে দেখি মাথার ওপর এক টুকরো মেঘ। ভালোভাবে তাকিয়ে দেখি জিবরীল। তিনি আমাকে বললেন, আপনার ক্বওম আপনাকে যা যা বলেছে সবই আল্লাহ তাআলা শুনেছেন। আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাদের পাঠানো হয়েছে। এরপর পাহাড়ের ফেরেশতারা আমাকে সালাম জানালেন, বললেন, ইয়া আল্লাহর রাসূল, আপনি যদি চান, ওদেরকে দুই পাহাড়ের মধ্যে পিষে দেবো।আমি বললাম, না, আমি আশা করি আল্লাহ তাআলা তাদের বংশধরদের মধ্যেএমন মানুষ সৃষ্টি করবেন, যারা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।
আসমান থেকে সাহায্য পেয়ে রসূলের মন শান্ত হলো। তিনি আবার চলতে লাগলেন থমালেন ওয়াদীয়া নাখলায় সেখানে তিনি বেশকিছু দিন অবস্থান করেন। একদিনতিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, সে এলাকায় কিছু জ্বিন ছিল তাঁর তিলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা রসূল (সাঃ) এর কাছে এসে
মুসলিম হয়ে যায়।
এই ঘটনা সূরা আহকাফে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন।
"স্মরণ করুন, আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জ্বীনকে, যারা
কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হলো; তারা একেঅপরকে বলতে লাগলঃ চুপ করে শোনো। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলোতখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে। তারাবলেছিলঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যাঅবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবংসত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।" (সূরা আহকাফ, ৪৬: ২৯-৩০)

ইসরা ও মিরাজ :-

আল্লাহ আয়ালা বলেন

'তিনি পবিত্র ও মহিমাময়; যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে মসজিদেহারাম থেকে মসজিদে আকসায় সফর করিয়েছেন, যার চারপাশ বরকতময়; তাঁকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য । তিনি সর্বশ্রোতা

ও সর্বদ্রষ্টা।' সূরা ইসরা : ১

রসূল (সাঃ) মক্কার জীবনেঅত্যাচার, নির্যাতন, অপবাদ চিন্তা ও মানসিক কষ্টে ভেঙে পড়ে এই অবস্থায় আল্লাহর রসূলের জন্যইসরা ও মিরাজ ছিল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি পুরস্কার।

ইসরা অর্থ রাত্রিকালীন ভ্রমণ। মিরাজ অর্থ আরোহনের মাধ্যম বা সিঁড়ি আল্লাহ তায়ালা রসূল (সাঃ)কে জিবরাঈল (আঃ) সাথে একটি বাহনের মাধ্যমে-মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস

সফর করান। এই ভ্রমণ নববী জীবনের ঠিক কোন সময়ে হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ আছেতবে সীরাহ পরম্পরা বিশ্লেষণ করলে বুঝায় ঘটনাটি ঘটেছিল তায়েফ থেকে ফিরে আসার পরএবং আকাবার শপথের কোনো এক সময়ে।ইসরা ও মিরাজের দিন

রসূল তাঁর চাচাতো বোন উম্মে হানি (রাঃ) সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে এ যান। বেশি রসূল সাঃ)এর কাছে একজন ফেরেশতা এসে রসূল (সাঃ) এর বক্ষবিদীর্ণ করে হৃদপিণ্ড বের করে এনে ঈমানে পূর্ণ একটি স্বর্ণের পাত্রে রাখলেন। সেটিকে পাত্রে ধুঁয়ের রসূলের বক্ষে বরিসে দেয়া হলো। রসূল (সাঃ) দুইবার এর বক্ষ বিদীর্ণ ঘটেছে।

হঠাৎ জিবরাইল ও মীকাইল আ. এসে বললেন- আমাদের সাথে চলুন ! অতঃপর তাঁকে বোরাকের উপর

আরোহণ করান হয় । যার চলার গতি এত দ্রুত ছিল যে, যেখানে তার দৃষ্টি পড়ত সেখানে তর কদম পড়ত। এরূপ দ্রুত গতিতে প্রথমে নবী করীম সা.কে সিরিয়ার মসজিদে আকসায় (বায়তুল মুকাদ্দাসে) নিয়ে যাওয়া হল । আল্লাহপাক সেখানে তাঁর

অভ্যার্থনার জন্যে সমস্ত নবী রাসূল আলায়হিমুস সালাম কে (মো'জেযা স্বরূপ) সমবেত করেছিলেন। জিবরাঈল আ. সেখানে পৌঁছে আযান দিলেন। নমাযের জন্যে সমস্ত আম্বিয়ে কেরাম আ. কাঁতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। সবার তখন অপেক্ষা নামায পড়াবে কে ? জিবরাঈল আ. নবী করীম সা. এর হস্ত মোবারক ধারণ করে অগ্রসর

করেদিলেন । তিনি সকল নবী রাসূল ও ফেরাতামগুলীর নামায পড়ালেন ।

এপর্যন্ত পার্থিব জগতের ভ্রমণ ছিল, যা বোরাকের মাধ্যমে হয়েছিল, অতঃপর

মহানবী সা.কে আসমান (তথা ঊর্ধ্ব জগত) সমূহে ভ্রমন করান হল । প্রথম আসমানে আদম আ. এর সাক্ষাত ঘটল । দ্বিতীয় আসমানে ঈসা ও য়ায়া আ. এর তৃতীয় আসমানে ইউসূফ আ. এর ৪র্থ আসমানে ইদরীস আ. এর, ৫ম আসমানে হারুন আ. এর, ৬ষ্ঠ আসমানে মূসা আ. এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম আ. এর সাক্ষাত হল। [সহীহ বুখারী সংজোষিত ফতহুল বারী ১৫ পারা ৪৮৫ পৃঃ)।

অতঃপর নবী করীম সা. সিদ্রাতুল মুনতাহার দিকে গমন করেন, পথিমধ্যে হাউযে কাউসার অতিক্রম করলেন। অতঃপর বেহেশতে প্রবেশ করলেন। সেখানে আল্লাহ তা'আলার অপূর্ব সৃষ্টি ও বিস্ময়কর বিষয়াদি অবলোকন করেন । যা অদ্যাবধি কোন নয়নে প্রত্যক্ষ করেনি, কোন কর্ণে শ্রবণ করেনি, আর মানুষে কল্পনা ও সেখানে পৌঁছতে পারেনি । অতঃপর দোযখ কে তার সম্মুখে উপস্থিত করা হল । যা সর্বপ্রকারে আযাব ও এমন কঠোর পীড়া দায়ক অগ্নিতে পূর্ণ যার সম্মুখে লোহা এবং কঠিন পাথরের ন্যায় বস্তুর কোন অস্তিত্ব নেই। দোযখের মধ্যে তিনি এক শ্রেণীর মানুষ কে মৃত পশুর গোশত ভক্ষণ করতে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন- এরা কারা ? জিবরাঈল আ. বললেন এরা ঐ সমস্ত লোক যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত। (অর্থাৎ তাদের দোষ চর্চা করত। অতঃপর দোযখের ফটক বন্ধ করে দেওয়া হল। এরপর রাসূল সা, সামনে অগ্রসর হলেন। জিবরাঈল আ. সেখানে থেকে গেলেন। কারণ তার সামনে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি ছিলনা। সামনে অগ্রসর হওয়ার পর মহান রাব্বুল আ'লামীনের সাথে সাক্ষাত ঘটল। বিশুদ্ধ মতে অত্র সাক্ষাত কেবল রুহানীভাবে নয় বরং স্বচক্ষে হয়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য মুহাক্কিক সাহাবী ও ইমামগণের এটাই অভিমত । রাসুল সা. সেখনে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং মহান আল্লাহ পাকের সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ করেন। সে সময় হতে নামায ফরয করা হয় । অতঃপর রাসূল সা. প্রত্যাবর্তন করলেন। বোরাকে আরোহণ করে মক্কা মুআ'যথামায় তশরীফ নেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে কুরাইশদের তিনটি বাণিজ্য কাফেলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। তন্মধ্য হতে কাউকে তিনি সালামও করেছিলেন। তাঁরা রাসূলে করীম সা. এর কণ্ঠস্বর অনুভব করেছিল। মক্কায় পৌঁছে তারা এর সাক্ষ্য ও প্রদান করেছিল। ভোর হওয়ার পূর্বেই এ সফর মোবারক সম্পন্ন হয়েছিল

ভোর হওয়ার পর যখন রাসূল সা. এর ইসরা তথা রাত্র কালীন ভ্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল তখন কাফেরদের মাঝে এক অভূত পূর্ব অবস্থা সৃষ্টি হল। কেউ করতালি দিতে লাগল । কেউ আশ্চার্যান্বিত হয়ে মাথায় হাত রাখল। কেউ বিদ্রুপের হাসি হাসতে লাগল । অবশেষে সকলে পরীক্ষার জন্যে রাসূল সা.কে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করতে শুরু করল। জিজ্ঞেস করল আচ্ছা! বলুন দেখি! বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ ও আকৃতি

কিরূপ ? পাহাড় থেকে কতটুকু দূরে অবস্থিত ? রাসূলে করীম সা. তার পূর্ণ চিত্র পেশ করলেন। এ ভাবে তারা বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করতে লাগল । তিনি তার উত্তর দিতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তারা এমন সব প্রশ্ন করতে শুরু করল যা একবার দেখা সত্বে কোন মানুষ উত্তর দিতে সক্ষম নয়। যেমন মসজিদটির কয়টি দরজা, কয়টি জানালা ইত্যাদি, স্পষ্টতঃ এ সব জিনিসকে কে গণনা করে ? এজন্যে নবী করীম সা. বেশ

চিন্তিত হলেন ; কিন্তু অলৌকিকভাবে মসজিদে আকসা কে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হল। আর তিনি গণনা করে করে উত্তর দিতে লাগলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিক রা. বলে উঠলেন-"আমি সাক্ষ্যদিচ্ছি আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল"। কুরাইশরা সবাই নির্বাক হয়ে গেল এবং বলল- আকৃতি প্রকৃতি তো সম্পূর্ণ সঠিক বলেছেন। অতঃপর হযরত আবুবকর ছিদ্দিক রা. এর প্রতিলক্ষ্য করে বলল

আপনি কি এ ঘটনাকে সঠিক প্রতিপন্ন করেন যে, তিনি একই রাত্রে সুদূর মসজিদে আকসা পৌঁছে আবার ফিরেও এসেছেন ? হযরত ছিদ্দীকে আকবর রা. বললেন-

আমিতো এর চেয়ে অনেক দূরের বিষয়াদিতে তাঁকে বিশ্বাস করেছি। আমি তো সকাল-সন্ধায় সামান্য মূহুর্তে তাঁর নিকট আসমানী সংবাদ পৌঁছার ব্যাপারে ও ঈমান রাখি। সুতরাং এ ব্যাপারে দ্বিধা থাকতে পারে কিরূপে ? একারণে তাকে ছিদ্দীক উপাধীতে ভূষিত করা হয় । অতঃপর কুরাইশরা পুনরায় পরীক্ষার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করল আচ্ছা বলুনতো সিরিয়াভীমূখে গমনকারী আমাদের বাণিজ্য কাফেলা কোথায় ? নবী করীম সা. বললেন অমুক গোত্রের এক বাণিজ্য কাফেলাকে আমি রাওহা নামক স্থানে অতিক্রম করে এসেছিলাম, তাদের উট হারিয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই তার খোঁজে বেরিয়েছিল । আমি যখন তাদের হাওদার নিকট গেলাম তখন সেখানে কেউই ছিলনা। একটি কলসে পানি রাখা ছিল আমি তা পান করেছিলাম ।

এরপর অমুক গোত্রের বণিক দলকে অমুক স্থানে অতিক্রম করছি। বোরাক তার নিকটবর্তী পৌঁছলে ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগল । তন্মধ্যে একটি লাল বর্ণের উট ছিল । যার উপর সাদা ও কালো রঙ্গের দুটি গদিছিল । সেটি তো বেহুস হয়ে পড়েই গিয়েছিল । তারপর অমুক গোত্রের বাণিজ্য কাফেলাকে আমি "তানঈম" নামক স্থানে অতিক্রম করেছি । তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিল একটি মেটে রঙ্গের উট । তার উপর একটি কাল চট ও দুটি থলে ছিল। কাফেলাটি অচিরেই তোমাদের নিকট এসে পৌঁছবে। মানুষে জিজ্ঞেস করল- কবে নাগাদ আসতে পারে ? নবীজী সা. বললেন আগামী বুধবারের মধ্যে এসে যাবে । সুতরাং দেখা গেল হুযুর সা. যেরূপ বলেছেলেন বাস্তবিকই তাই হল । আর ঐ সব কাফেলা ও হুযুর সা. এর বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করল ।

কুরাইশদের নিকট যখন আল্লাহ তা'আলার দলীল পূর্ণ হয়ে গেল। এবং এ বিস্ময়কর ভ্রমণের ব্যাপারে স্বয়ং তদেরই গোত্রের মানুষ সাক্ষ্য দিল তখন ঐ সকল শত্রুদের জন্য এ ছাড়া আর অস্বীকারের কোন উপায় থাকল না যে, এ ভ্রমনকে যাদু ও নবী করীম সা. কে (নাউযুবিল্লাহ !) যাদুকর আখ্যায়িত করে উঠে চলে গেল।

আকাবার প্রথম শপথ :-

নবুওয়াতের একাদশ বর্ষের হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিবের ৬ জন যুবক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তারা রাসূল সাঃ কে কথা দিয়েছিলেন যে, ইয়াসরিবে ফিরে গিয়ে তারা ইসলাম প্রচার করবেন। পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবুয়াতের দ্বাদশ বছরে হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিব থেকে ১২ জন লোক (বাজরাজ থেকে ১০ জন আর আওস থেকে ২ জন) রাসূলের সাথে দেখা করতে আসেন। এদের মধ্যে পাঁচজন গত বছরেও এসেছিলেন। আর বাকি সাতজন ছিলেন নতুন। এই লোকগুলো মিনার আকাবা নামক স্থানে রাসূলের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর প্রচারিত দ্বীনের ব্যাপারে কিছু কথা মেনে চলার অঙ্গীকার করেন।

'আক্বাবার প্রথম বৈঠকের রাতে রাসূলুল্লাহর কাছে এই মর্মে বাইয়াত দেওয়া হয় যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আমরা ব্যভিচারের ধারে কাছে যাবো না, সন্তান হত্যা করবো না, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেব না এবং ভালো কাজে তাঁর বিরোধিতা করবো না। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, যদি তোমরা এগুলো মেনে চলতে পার তাহলে জান্নাতে যেতে পারবে। আর যদি কোনো পাপ করে ফেল এবং সেই পাপের শাস্তি যদি এই দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই পাপ মাফ করে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি দুনিয়াতে পাপের শাস্তি না দেওয়া হয় তাহলে আল্লাহ তাআলাইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ওই পাপের জন্য শেষ বিচারের দিন শাস্তি দিতেও পারেনআবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন।'

এই বাইয়াতে জিহাদের ব্যাপারে কোন অঙ্গীকার ছিল না। সাধারণত মহিলাগণ ইসলাম গ্রহণের সময় রাসূল সাঃ এর কাছে এসব বিষয়ের অঙ্গীকার করতেন। এজন্য এই বাইয়াতকে বলা হয় 'বাইয়াতুন নিসা' বা 'মহিলাদের বাইয়াত'।

হজ্ব সমাপ্ত হয়ে গেলে এই দলটির সাথে রাসূল (সাঃ) প্রথম মক্কা থেকে ধর্মপ্রচারক হিসেবে মুসআব বিন উমায়ের রাঃ (কোন কোন বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাঃ এর নামও এসেছে) প্রেরণ করলেন। মুসআব বিন উমায়ের ইয়াসরিবে গিয়ে আস'আদ বিন যুরারাহ রাঃ এর বাড়িতে আশ্রয় নিলেন এবং তারা দুজনে মিলে প্রবল উদ্যমের সাথে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করলেন। তাঁর এই ইসলামের প্রচার কাজের জন্য তার উপাধি দেওয়া হয়- 'মুকরিউন' (উস্তাদ/শিক্ষক)।

আকাবার দ্বিতীয় শপথ (বাইয়াতুল আকাবা আস সানিয়াহ):-

পরের বছর অর্থাৎ নবুওয়াতের ১৩তম বছরে পুনরায় হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিবের ৪০০ জনেরও অধিক অমুসলিম এবং ৭০ জনেরও অধিক (প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী-৭৫ জন) মুসলিম হাজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসলেন এবং মুসলিমগণ রাসূল (সাঃ) এর সাথে যোগাযোগ শুরু করলেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, মুসআব বিন উমায়ের রাঃ তাঁদেরকে সাথে করে মক্কায় নিয়ে আসেন। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো যে, ১২ই জিলহজ্ব তারিখে মিনায় জামরাই আকাবার নিকটে যে সুড়ঙ্গ রয়েছে সেখানে তারা একত্রিত হবেন এবং সে সমাবেশ গোপনে রাতের অন্ধকারে হবে। এই সমাবেশের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে কা'ব বিন মালিক রাঃ বলেন- "আমরা হজ্বের জন্য বের হলাম। আহইয়ামে তাশরীক এর মধ্যবর্তী দিবাগত রাতে রাসূলের সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত হলো এবং আমরা হাজ্ব থেকে ফারেগ হয়ে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের সঙ্গে আমাদের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা আব্দুল্লাহ বিন হারাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি। মুশরিকগণের মধ্যে একমাত্র তাকেই আমরা সঙ্গে নিয়েছিলাম। আমাদের সাথে আগত অন্যান্য মুশরিকদের থেকে আমাদের কাজকর্ম কথাবার্তা গোপন রাখছিলাম। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারামের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা ঠিকই চলছিল। আমরা তাকে বললাম, "হে আবূ জাবির! আপনি আমাদের একজন প্রভাবশালী এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নেতা। আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সূত্রে আমরা আপনাকে বর্তমান অবস্থা থেকে
বের করে আনতে চাচ্ছি যাতে করে আপনি জাহান্নামের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ইন্ধন না হয়ে যান। এরপর তাকে আমরা ইসলামের দাওয়াত দিলাম এবং বললাম যে, আজ আকাবায় রাসূল সাঃ এর সাথে আমাদের সাক্ষাতের কথা আছে"। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং আমাদের সাথে আকাবায় গেলেন। তারপর তিনি আমাদের নেতা নির্বাচিত হলেন। আমরা এ রাতেও যথারীতি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলো, তখন আমরা নিজ নিজ স্থান থেকে বের হয়ে রাসূলের সাথে সাক্ষাতের জন্য সেভাবে নির্ধারিত স্থানে গেলাম যেভাবে পাখি নিজ বাসা থেকে নিজেকে জড়োসড়ো করে বের
করে। শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই আকাবায় একত্রিত হলাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম মোট ৭৫ জন- ৭৩ জন
পুরুষ এবং ২ জন মহিলা। মহিলা দুজনের একজন ছিলেন- উম্মু 'উমারা নুসাইবা বিনতে কা'ব এবং আরেকজন ছিলেন উম্মু মানী আসমা বিনতে 'আমর।আমরা সকলে সুড়ঙ্গে একত্রিত হয়ে রাসূল সাঃ এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত সেই

আকাঙ্খিত মুহূর্তে এসে পড়ল এবং তিনি আসলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব। যদিও
তিনি তখনও আপন সম্প্রদায়ের ধর্মের উপরেই ছিলেন। তবুও তিনি চাচ্ছিলেন ভাতিজার নিরাপত্তার জন্য
উপস্থিত থাকতে। তিনি সর্বপ্রথম কথা বলা আরম্ভ করেন"।

আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রাঃ এর প্রারম্ভিক ভাষণঃ
রাসূলের সাথে আনসারদের সম্পাদিত চুক্তির ফলে তাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছে এবং
এর পরিণামে যে নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তা ব্যাখ্যা করার জন্য আব্বাস সর্বপ্রথম কথা বললেন। তিনি
বললেন, "হে খাজরাজ এর লোকজন! (আরবদের কাছে তখন আওস ও খাজরাজ উভয় গোত্র সম্মিলিতভাবে
খাজরাজ নামে অভিহিত হত) আমাদের মধ্যে মুহাম্মাদের যে মর্যাদা ও অবস্থান তা তোমরা সকলেই জানো। ধর্মের ব্যাপারে আমরা যে মনোভাব পোষণ করি, আমাদের সম্প্রদায়ের লোকজনও একই মনোভাব পোষণ করে। আমরা তাকে তার বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করেছি। তিনি এখন আপন বাসস্থানে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে মান-সম্মান, শক্তি-সামর্থ্য এবং হেফাজতের সঙ্গেই রয়েছেন।কিন্তু এখন তিনি তোমাদের
সেখানে গিয়ে তোমাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ। এ অবস্থায় যদি এমন হয় যে তোমরা তার
কাজকর্মে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করবে এবং তাকে বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট
থাকবে। তাহলে ঠিক আছে! কিন্তু যদি এমন হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে গিয়েআলাদা হয়ে যাবে কিংবা
প্রয়োজনে তোমরা তার কোন উপকারে আসবে না তাহলে তাকে এখনই ছেড়ে দাও। কেননা তিনি নিজ আবাসিক নগরীতে আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে মান-সম্মান ও হেফাজতের সঙ্গেই রয়েছেন।' কা'ব রাঃ বলেন, আব্বাসকে আমি বললাম, 'আমরা আপনার কথা শুনেছি।' তারপর রাসূলকে লক্ষ্য করে
বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কথা বলুন এবং নিজের জন্য ও নিজ রবের জন্য যে সন্ধি ও চুক্তি করতে পছন্দ করেন, তা করুন।' এরপর রাসূল কথা বললেন। তিনি প্রথমে কোরআন শরীফ থেকে কিছু অংশ তেলাওয়াত করলেন, আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পেশ

করলেন এবং ইসলামের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করলেন। এরপর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন।

হিজরত:-

হিজরত দুই প্রকার। একটি আক্ষরিক অর্থে আরেকটি রূপক অর্থে। আন-নাসাঈর একটি হাদীসে রূপক অর্থের হিজরত সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ আযযা ওয়াজাল যা অপছন্দ করেন তা ত্যাগ করা হলো হিজরত।' এই অর্থে হিজরত বলতে বোঝায় গুনাহগার অবস্থা ছেড়ে আল্লাহ আযযা ওয়া জালের কাছে পরিপূর্ণ আনুগত্য সহকারে ফিরে আসা। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল কুরআনে বলেন, 'অপবিত্রতা হতে দূরে থাকো"। অপবিত্রতা, মূর্তিপূজা ও হারাম কাজ ছেড়ে চলে আসাও একধরনের হিজরত আর এই ধরনের হিজরত করা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক।

আরেক ধরনের হিজরত হলো দেশান্তরী হওয়া, খারাপ জায়গা ছেড়ে ভালো জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া, কুফফার শাসিত রাষ্ট্র থেকে ইসলামিক শরীয়াহ শাসিত রাষ্ট্রে চলে যাওয়া। এই ধরনের হিজরতের উদাহরণ হলো রাসূলুল্লাহ ও সাহাবীদের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করা অথবা বনী ইসরাইলের সেই ব্যক্তির হিজরত, যে একশোনলোক খুন করার পর এক আলিমের কাছে যায় এবং সেই আলিম তাকে বলেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমার তওবা কবুল করবেন, কিন্তু তোমাকে এই খারাপ জায়গা ত্যাগ করতে হবে এবং এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে জনগণ তোমাকে আল্লাহতাআলার ইবাদত করতে সাহায্য করবে।

রসূল সাঃ ও আবু বকর রাঃ এর হিজরত:-আক্বাবার দ্বিতীয় শপথের আনুমানিক আড়াই মাস পর নবুয়তের চতুর্দশ বছরের ২৬ সফর মক্কার দারুন নাদওয়াতে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এক মহা সম্মেলন আয়োজন করে। এই সম্মেলনে কুরাইশের সকল নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনের মূল এজেন্ডা ছিল, এমন একটি অকাট্য পরিকল্পনা তৈরি করা যাতে যত শীঘ্র সম্ভব ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহী রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম কে হত্যার মাধ্যমে ইসলামের অস্তিত্ব কে সম্পূর্ণরূপে আরব ভূখণ্ড থেকে মুছে ফেলা হয়।

দারুন নাদওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন বসলো, শিরোনাম: মুহাম্মাদকে কীভাবে থামানো যায়:-

কুরাইশদের বড় বড় নেতারা এ অধিবেশনে অংশ নিল। বেশ কিছু প্রস্তাব এলো। কেউ প্রস্তাব করলো তাঁকে কারাগারে আটকে রাখা হোক। কিন্তু এ প্রস্তাব খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কারণ তারা খুব ভালো করে জানতো যে, রাসূলুল্লাহকে কারাগারে প্রেরণ করলে সাহাবীগণ তাঁকে ছাড়িয়ে নিতে পারবেন, এমনকি তাঁরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করে বসতে পারেন। প্রস্তাব হলো, রাসূলুল্লাহকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া। কিন্তু এ প্রস্তাবও খুব একটা হালে পানি পেল না, কারণ রাসূলুল্লাহর কথাবার্তা ছিল খুবই চমৎকার, তাঁর সুন্দর কথা শুনে মক্কার বাইরের লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর দলে যোগ দিয়ে মক্কায় আক্রমণ চালাতে পারে।

সর্বশেষ এবং সবচেয়ে জঘন্য প্রস্তাব ছিল নবীজিকে হত্যা করা। এই প্রস্তাব আর কারো নয়, এই প্রস্তাব কুখ্যাত আবু জাহেলের। সে প্রস্তাব করলো, প্রত্যেক শক্তিশালী অভিজাত বংশের একজন করে শক্তসমর্থ কাউকে পাঠানো হবে। তাদের সবার হাতে থাকবে একটি করে ধারালো তলোয়ার। তারা সবাই একযোগে রাসূলুল্লাহকে হত্যা করবে। ফলে হত্যার দায় নির্দিষ্ট কাউকে বহন করতে হবে না,

মক্কার সমস্ত গোত্র এই হত্যার দায়ভার নেবে। সেক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর পরিবার মক্কার সব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে পারবে না, তারা রক্তপণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হবে। মুশরিকরাও খুশি মনে রক্তপণ দিয়ে দিবে। প্রস্তাবটি জঘন্য হলেও বেশ কাالْمَاكِرِين

আল্লাহ জিবরীলের মাধ্যমে আয়াত নাজিল করে কুরাইশদের এই ঘৃণ্য চক্রান্ত রাসূলকে জানিয়ে দিলেন।

আল্লাহ নাযিল করলেন-

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِين

অর্থঃ আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের

করে দেয়ার জন্য তখন তারা যেমন কৌশল করত তেমনি, আল্লাহও কৌশল করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর কৌশল সবচেয়ে উত্তম। (সূরা আনফাল, ৮:৩০)

জিব্রাইল আঃ রাসূলকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

এরপর তাকে হিজরতের সময় নির্ধারণ করে দিলেন এবং কুরাইশদেরকে কিভাবে প্রতিহত করতে হবে তাও

বলে দিলেন। এরপর বললেন, “আপনি আজ রাত্রে নিজ বিছানায় শয়ন করবেন না”। ইমাম তিরমিযী সহীহ

হাদীসে বর্ণনা করেছেন, হিজরতের মুহূর্তে পাঠ করার জন্য জিবরীল নিম্নোক্ত দূয়াটি রাসূল সাঃ কে শিখিয়ে
দিলেন-
وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا
অর্থঃ বলুনঃ হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং দান করা করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য। (সূরা ইসরা, ১৭:৮০)

হিজরতের অনুমতি পেয়ে রাসুল সাঃ ভরদুপুরে আবু বকরের গৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল,
হিজরতের প্রক্রিয়া ও প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করা। আয়েশা রাঃ বলেন, "আমরা গ্রীষ্মের দুপুরে বাড়িতে বসে
ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে খবর দিল যে রাসূল সাঃ আগমন করেছেন। তিনি সেদিন এমন এক সময় এসেছিলেন, যে সময় রাসুল সাঃ সাধারণত কোথাও যেতে না"। তখন আবু বকর রাঃ বললেন, "আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। নিশ্চয় আপনি এ সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য এসেছেন"।
রাসুল ভিতর এসে আবু বকরকে বললেন, আপনার কাছে যে সকল লোক রয়েছে তাদের সরিয়ে দিন। আবু বকর বললেন, আপনার স্ত্রী ছাড়া আর কেউই নেই। তখন রাসূল তাঁকে জানালেন আল্লাহ তাকে হিজরত
নির্বাচন করেছেন। একথা আবু বকরকে জানিয়ে রাসুল ঘরে ফিরে আসলেন এবং হিজরতের জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করলেন। হিজরতের কথা শুনে তিনি রাসূল সাঃ কে দুটি থেকে একটি উষ্ট্রী ইচ্ছামতো হাদিয়া হিসেবে বেছে নিতে বললেন। কিন্তু রাসূল সাঃ জানিয়ে দিলেন তিনি উষ্ট্রীর মূল্য পরিশোধ না করে নিবেন না।
ওদিকে কুরাইশরা তাদের ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ১১ জন পাপিষ্ঠ নির্বাচন করল। রাসুল সাঃ সাধারণত এশার পর পরই ঘুমিয়ে যেতেন এবং মাঝ রাতে জেগে মাসজিদুল হারামে চলে যেতেন। আর সেখানেই তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। তাই কাফেররা ঠিক করল, রাসুল সাঃ যখন মধ্যরাত্রিতে বের
হয়ে মাসজিদুল হারামের সামনে আসবেন তখন তারা তাকে হত্যা করবে। রাসুল সাঃ আলীকে বললেন, "তুমি আমার এই সবুজ হাযরামি চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় ঘুমিয়ে থাকো। তারা তোমার ক্ষতি করতে

পারবে না"। এরপর যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে গেল, সমগ্র মক্কায় পিনপতন নিরবতা নেমে আসলো এবং অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে পড়ল। এমন সময় কুরাইশদের নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ রাসূলের ঘরের দরজায় অবস্থান করল। তাদের পরিকল্পনা ছিল রাসুল যখনই ঘর থেকে বের হবেন তাঁরা রাসূলের উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করবে। এ সময় দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আবু জাহল হাসতে হাসতে বলছিল, "মুহাম্মাদের ধারণা হল, যদি তোমরা তার অনুসরণ করো তাহলে দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় আরব-আজমের বাদশাহ হয়ে যেতে পারবে। আর মৃত্যুর পর তোমাদের উন্নত বেহেশত মিলবে। আর যদি তার উপর ঈমান না আনো তাহলে দুনিয়ায় তার অনুসারীদের হাতে মারা পড়বে আর মারা যাওয়ার পর জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে"।

ঘরের মধ্যে রাসুল সাঃ আলী কে নিজের হাযরামী চাদর গায়ে দিয়ে শুইয়ে দিলেন। এরপর ঘর থেকে বের

হলেন এবং একমুষ্টি মাটি নিয়ে তাদের মাথার উপর ছুড়ে মারলেন। এসময় তিনি তিলাওয়াত করলেন সূরা

ইয়াসিন এর ৯ নং আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন (ইবনে হিশামের বর্ণনায় রয়েছে, সূরা ইয়াসিনের ১-৯

আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন)

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ

অর্থঃ আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে

তারা দেখে না। (সূরা ইয়াসিন, ৩৬:৯)

এসময় এমন কোন মুশরিক বাকি ছিল না যার মাথায় সে মাটি গিয়ে পৌঁছে নি এবং এর আল্লাহ মুশরিকদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলেন। রাসূল সাঃ তাদের সামনে দিয়ে নিরাপদে বের হয়ে চলে আসলেন এবং আবু বকরের বাড়ি চলে গেলেন। সেখান থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবু বকরকে এবং মাল-সামানা সাথী নিয়ে ইয়ামান অভিমুখে যাত্রা করলেন। এদিকে আসমা বিনতে আবু বকর সফরের সামগ্রী নিয়ে এলেন (ভিন্ন বর্ণনায়- সফরের জন্য নাস্তা বানিয়ে নিয়ে এলেন) কিন্তু তিনি দেখলেন সেগুলোর মুখ বাঁধার জন্য রশি নেই। এ সময় তিনি তার কোমরবন্ধ খুলে তা দুভাগ করে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর এক অংশের সাহায্যে সামানার মুখ বেঁধে দিলেন এবং দ্বিতীয় অংশ দিয়ে কোমর জড়িয়ে নিলেন (ভিন্ন বর্ণনায়- এক অংশ দিয়ে নাস্তার পাত্র বাঁধেনআর আরেক অংশ দিয়ে পানির মশকের মুখ বাঁধেন)। এ কারণেই তাঁর উপাধি হয়েছিল "যাতুন নিত্বাক্বাইন" 'দু'টুকরো কোমর বন্ধনীধারী'।

উম্ম মা'বাদের তাঁবুতে যাত্রাবিরতি:-

যাত্রাপথে রাসূলুল্লাহ ও আবু বকর খুযাআ গোত্রের উমা মা'বাদ নামক এক মহিলার তাঁবুর কাছে থামেন। উমা মা'বাদ ছিলেন একজন দানশীল মহিলা। তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়া পথিকদের তিনি আপ্যায়ন করতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ও আবু বকরকে উমা মা'বাদ কিছুই দিতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ উমা মা'বাদের কাছে খাবারের খোঁজ করেন। উমা মা'বাদ বললেন যে যদি দেওয়ার মতো কিছু থাকতো তাহলে তাঁর কাছে চাওয়া লাগতো না, বরং তিনি নিজে থেকেই দিতেন। আসলে উম্মে মা'বাদের শুধু একটি দুর্বল বকরী ছিল। খরার কারণে সেটির দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল।

রসূল সাঃ বকরীর দুধ দোহানোর জন্য তাঁর কাছে অনুমতি চান। উম্ম মা'বাদ তাঁকে অনুমতি দেন। রাসূলুল্লাহ তাঁর কাছ থেকে একটি বড় পাত্র চেয়ে নেন। তিনি বকরীটিকে স্পর্শ করামাত্রই বকরীটি দুধ দেওয়া শুরু করে। পাত্র না ভরা পর্যন্ত বকরীটি দুধ দিতে লাগল। পাত্রটি ভরে গেলে রসূল সাঃপ্রথমে তা উম্ম মা'বাদকে দেন। এরপর একে একে সবাই তৃষ্ণা মিটিয়ে দুধ পান করেন।

রাসূলুল্লাহ সবার শেষে দুধ পান করেন। দুধ পান শেষে তিনি বলেন, "ঘরের সেবকরা সবার শেষেই পান করে।' রাসূলুল্লাহ উম্মে মা'বাদের জন্য পাত্রে কিছু দুধ রেখে দেন। উম্ম মা'বাদের স্বামী বকরীর পাল নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে দুধ দেখে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই দুধ কোথা থেকে এল?" উম্ম মা'বাদ বললেন, 'এক বরকতময় লোক এসেছিলেন আজ। তিনি-ই বকরীর দুধ দোহন করেছেন।' আবু মা'বাদ স্ত্রীর কাছে সেই লোকের বর্ণনা শুনতে চাইলেন। উম্ম মা'বাদ রাসূলুল্লাহকে একবার মাত্র দেখেছিলেন। কিন্তু যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা এখন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর সম্পর্কে দেওয়া শ্রেষ্ঠ বর্ণনা।

'আমি তাঁকে দেখেছি, উজ্জ্বলদীপ্ত চেহারা, সুন্দর তাঁর গড়ন, সুদর্শন তাঁর মুখশ্রী, ছিপছিপে তাঁর শরীর। মাথাটা খুব ছোট নয়, বরং দেখতে তিনি অভিজাত এবং সুপুরুষ। চোখদুটো তাঁর ঘনকালো, পাঁপড়িগুলো টানাটানা।

বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর চেহারা, ভরাট তাঁর কণ্ঠস্বর। ভ্রু-যুগল উঁচু আর ধনুকের মতো বাকাঁনো, চুলগুলো পরিপাটি। তাঁর গ্রীবা বিস্তৃত এবং দাড়ি বেশ ঘন। তাঁর। গাম্ভীর্য তাঁর আত্মমর্যাদা প্রকাশ করে, তাঁর কথা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। তাঁর কথাগুলো মনোমুগ্ধকর আর দৃঢ়, চটুল কিংবা ফেলনা নয়। তাঁর

প্রতিটি শব্দ যেন সুতোয় বাঁধা মুক্তোর মতো মসৃণ। দূর থেকে তাঁকে দেখতে যেমন উজ্জ্বল আর আকর্ষণীয়, কাছ থেকে দেখলেও তাঁকেই সবচেয়ে সুদর্শন লাগে। উচ্চতায় তিনি মাঝারি। খুব লম্বাও নন আবার খাটোও নন। বাকি দুইজনের মাঝে তিনি উঁচু বৃক্ষের শাখার মতো, তবে তিনজনের মাঝে তিনিই সবচে সুন্দর। তিনি ছিলেন তাঁর সঙ্গীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি যখন কথা বলতেন, তারা মন দিয়ে শুনতো, তিনি যখন কিছু আদেশ দিতেন তা পালন করতে তারা ছুটে যেতো। তিনি কখনও মুখ গোমড়া করেননি। আর কেউ একবারও তাঁর কথার বিরোধিতা করেনি।

বর্ণনা শুনে আবু মা'বাদ বললেন, ‘এই লোকটি নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ । তাঁকে তো কুরাইশরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি যদি তাঁর সাথে দেখা করতে পারতাম তাহলে তাঁরকাছে মুসলিম হওয়ার স্বীকারোক্তি দিতাম।' তাঁর স্ত্রী উম্ম মা'বাদ আগেই রাসূলুল্লাহর কাছে ইসলাম গ্রহণের স্বীকারোক্তি দিয়ে মুসলিম হয়েছিলেন।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে মদীনায়:-

রাসূলুল্লাহর মদীনাতে আগমনের দিনটি ছিল একটি চমৎকার দিন। চারদিকে সাজ সাজ রব, রাসূলুল্লাহর প্রবেশ উপলক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি। মানুষজন তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছিল, পুরুষেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে, আবিসিনিয়ানরা তাদের বর্শা নাচাচ্ছিল। মহিলারা ছাদে দাঁড়িয়েছিল আর রাসূলুল্লাহকে একনজর দেখার জন্য বাচ্চারা রাস্তায় নেমে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহকে তারা বরণ করে নেয় চমৎকার একটি নাশীদ গেয়ে, চৌদ্দশ বছর পরেও মুসলিমদের কাছে অতি প্রিয় একটি সুর।

তালা আলা বাদরু আলাইনা
মিন সানিয়াতিল ওয়াদা
ওয়াজাবাশ শুরুরু আলাইনা
মাদা 'আ লিল্লাহি দা

আনাস ইবন মালিক বলেন, 'আমি দুটি দিন দেখেছি। একটি হচ্ছে আমার

জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও উত্তম দিন। এই দিনটি হলো রাসূলুল্লাহ ও আবু বকরের মদীনায় আগমনের দিন। অন্যদিনটি হলো আমার জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার ও দুঃখের দিন। সেটি রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর দিন। আমি শুধু এই দুটি দিনই দেখেছি।' রাসূলুল্লাহর আগমনের আনন্দে বৃদ্ধ লোকরাও সেদিন ঘর থেকে বের হয়ে এসে ছাদের উপর দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকেন, 'কোন সে জন? কোন সে জন?' আনাস ইবনে মালিকের ভাষায়, 'এমন দৃশ্য আমি এর আগে কোনোদিন দেখিনি!’

আইশা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহার সাথে বিয়ে :-

সাথে সংসার শুরু করেন হিজরতের পর, সেটা হিজরতের প্রথম বা দ্বিতীয় বছরের ঘটনা, যদিও তাদের বিয়ে হয়েছিল মাক্কী জীবনের শেষের
দিকে যখন আ’ইশার বয়স ছিল ছয় বছর। মদীনায় আসার পরে তাঁকে রাসূলুল্লাহর ঘরে তুলে আনা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর।
রাসূলুল্লাহ যখন আ'ইশাকে বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৪ বছর,
কিন্তু তখনও তিনি আসলে যেন যুবক! আমরা হাদীস থেকে জানতে পারি যে,
রাসূলুল্লাহ আ'ইশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। বয়স রাসূলুল্লাহকে বেঁধে রাখতে পারেনি, তিনি তাঁর স্ত্রী আ'ইশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন! যেমন, একদিন তাঁরা দু'জন সফরে বের হয়েছিলেন, আ'ইশা সেদিনের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে, ‘আমি তাঁর সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দিলাম এবং জিতে গেলাম! কিন্তু পরে যখন আমি কিছুটাসমোটা হয়ে গেলাম, তখন আবার তাঁর সাথে দৌড়ে অংশ নিলাম কিন্তু এবার তিনি আমাকে দৌড়ে হারিয়ে দেন। আর তখন তিনি বললেন, এটা হলো পূর্বের হারের
বদলা!’অর্থাৎ আগেরবার আ'ইশা জিতেছিলেন, আর পরেরবার জিতলেন
রাসূলুল্লাহ । রাসূলুল্লাহ বেশ স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ ছিলেন আর আল্লাহ তাআলার
রাসূল হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর এরকম শারীরিক দক্ষতার দরকার ছিল। রাসূলুল্লাহ যখন রাবিআ গোত্রের প্রতিনিধিদলের সাথে দেখা করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৫০ বছর। কিন্তু রাবিআ গোত্রের নেতা তার গোত্রের লোকদের কাছে রাসূলুল্লাহকে 'যুবক' হিসেবে উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ ছিলেন খুবই প্রাণবন্ত এবং উদ্যমী একজন মানুষ। তাই তাঁকে দেখে তরুণ মনে হতো। এছাড়াও আনাস ইবন মালিকের বর্ণিত হিজরতের কাহিনিতেও রাসূলুল্লাহ কেমন ছিলেন তা বোঝা যায়। তিনি উল্লেখ করেন, ‘যখন রাসূলুল্লাহ

হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন লোকজন আবু বকরকে চিনতে পারেনি কারণ রাসূলুল্লাহকে চিনতে পারলেও রাসূলুল্লাহকে ও আবু বকর মরুভূমির মধ্য দিয়ে দেখতে যুবকদের মতো লাগতো আর সেটা তারা ধারণা করেনি।' আনাস তাঁর সেই বর্ণনায় আবু বকরকে 'বয়স্ক ব্যক্তি' আর রাসূলুল্লাহকে উল্লেখ করেছেন 'যুবক' হিসেবে। এ সম্পর্কে ইবন হাজার আল-।আসকালানি মন্তব্য করেছেন যে, আবু বকরের বয়স যেমন তেমনই লাগতো, বড় বা ছোট মনে হতো না। অন্যদিকে, রাসূলুল্লাহ আবু বকরের চেয়ে দুই বছরের বড় ছিলেন কিন্তু তারপরও তাঁকে দেখতে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক মনে হতো।

আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন:-

ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। তিনি যা বলেননি, তা তার ওপর আরোপ করা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি প্রতি দুইজনের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। এরপর তিনি আলী ইবনে আবু তালিবের হাত ধরে বললেন, "এ হলো আমার ভাই।" এভাবে নবীদের সরদার মুত্তাকীদের নেতা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের রাসূল, বিশ্বজাহানে যাঁর কোন জুটি নেই- তিনি আর আবু তালিব তনয় আলী (রা) নতুন করে ভ্রাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। আর আল্লাহ ও রাসূলের সিংহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও যায়িদ ইবনে হারেসার ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপিত হলো। উহুদ যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে হামযা অছিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত্যু হলে যায়িদ ইবনে হারেসা তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন। আবু তালিবের পুত্র জাফর তাইয়ার ও বনু সালামা বংশোদ্ভূত মুয়ায ইবনে জাবাল পরস্পর ভ্রাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আবু বাক্ সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু ও খাবেজা ইবনে যুহায়ের পরস্পর ভ্রাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উমার ইবনুল খাত্তাব ও ইতবান ইবনে মালিক পরস্পর ভাই হন। আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ও সা'দ ইবনে মুয়ায, আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও সা'দ ইবনে রাবী, যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও সালামা ইবনে সুলামা, উসমান ইবনে আফফান ও আওস ইবনে সাবিত, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ও কা'ব ইবনে মালিক, সাঈদ ইবনে যায়িদ ও উবাই ইবনে কা'ব, মুসআব ইবনে উমাইর ও আবু আইয়ূব খালিদ, আবু হুযাইফা ইবনে উতবা ও "উব্বাদ ইবনে বিশর, আম্মার ইবনে ইয়াসার ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং আবু যার গিফারী ও মুনযির ইবনে আমর পরস্পর ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করেন । এছাড়াও হাতিব ইবনে আবু বালতাআ

ও উয়াইম ইবনে সায়েদা, সালমান ফারসী ও আবুদ দারদা এবং আবু বারের (রা) আযাদকৃত দাস বিলাল ও আবু রুয়াইহার মধ্যে ভ্রাতৃ বন্ধন স্থাপিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যে সব সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন তাদের মধ্যে উল্লিখিত সাহাবীদের নামই আমি জানতে পেরেছি।

আযানের সূচনা :-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাঁর মুহাজির ভাইদের সবাইকে কাছে পেয়ে এবং আনসারদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তখন ইসলাম একটি সুসংহত শক্তিতে পরিণত হলো। সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত নামায কায়েমের ব্যবস্থা হলো, যাকাত ও রোযা ফরয হলো এবং অপরাধ দমনের আইন চালু হলো । হালাল হারামের বিধানও কার্যকর হলো। এভাবে ইসলাম তাদের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। আনসারদের এই গোত্রটিই ঈমান গ্রহণের পর এখানে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর মুসলমানগণ নামাযের সময় হলেই তাঁর কাছে আপনা থেকেই জমায়েত হতো, ডাকতে হতো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনস্থ করলেন, ইহুদীরা যেমন শিঙ্গা বাজিয়ে নামাযের জন্য লোক জমায়েত করে থাকে তিনিও তেমনি শিঙ্গা বাজানোর ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু পরক্ষণেই ব্যাপারটা তাঁর

মনঃপূত না হওয়ায় বাদ দিলেন। এরপর ঘণ্টা বাজিয়ে মুসলমানদেরকে নামাযে ডাকার বিষয়টি চিন্তা করলেন। এইসব চিন্তাভাবনা চলাকালেই আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদ কিভাবে মানুষকে ডেকে জমায়েত করতে হয় তা স্বপ্নে দেখলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, অচেনা একজন লোক সবুজ কাপড় পরে এবং একটা ঘণ্টা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকটা আমার কাছ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় আমি তাকে বললাম, 'ওহে আল্লাহর বান্দা, তুমি কি এই ঘণ্টাটা বিক্রি করবে?' সে বললো, 'ঘণ্টা দিয়ে তুমি কি করবে?' আমি বললাম, 'নামাযের জন্য লোকজনকে ডাকবো।' সে বললো, 'তোমাকে এর চেয়ে ভালো জিনিস শিখিয়ে দেবো?' আমি বললাম, “কি জিনিস, বলতো। সে বললো, *'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা* ইল্লাল্লাহ।” রাসূলুল্লাহকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, “ইনশাআল্লাহ এই স্বপ্ন সত্য। তুমি বিলালকে নিয়ে এক জায়গায় দাঁড়াও। তাকে কথাগুলো শিখিয়ে দাও। সে আযান দিক। কেননা ওর আওয়াজ

তোমার আওয়াজের চেয়ে বড়ো।” বিলাল আযান দিলেন। উমার ঘরে বসে তা শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চাদর টানতে টানতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর কসম, আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদ যে স্বপ্ন দেখেছে, আমিও সেই রকম দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আলহামদু লিল্লাহ' বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।”

জিহাদের সূচনা :-

মাদানী যুগ মানেই জিহাদের যুগ। তাই রাসূলুল্লাহর সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগে জিহাদ কী তা বোঝা জরুরি। মাদানী যুগ ছিল ১০ বছর স্থায়ী আর এই অল্প সময়ে রাসূলুল্লাহ নিজে ১৯টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ৫৫টির বেশি সামরিক অভিযান পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ এই ১০ বছরের মধ্যে ৭০টিরও বেশি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, বছরে গড়ে ৭টি করে যুদ্ধ। যুদ্ধ মানেই ব্যাপক প্রস্তুতি, অর্থায়ন, অস্ত্রায়ণ এবং সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত করা – এই প্রতিটি কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়সাপেক্ষ। এছাড়াও তখনকার প্রযুক্তিতে আকাশপথের ব্যবহার ছিল না তাই একেকটি অভিযান বা যুদ্ধস্থলে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় করে পৌঁছাতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে অনেক সময় লেগে যেতো। এর থেকে বোঝা যায় মদীনার যুগ ছিল কেবলই যুদ্ধের যুগ এবং এই যুদ্ধগুলোর পেছনে অনেক শ্রম, সময় ও অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে রাসূলুল্লাহ কেন এসব যুদ্ধের পেছনে এত সময় ও শক্তি ব্যয় করলেন।জিহাদ নিয়ে আলোচনা করা আরেকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো বর্তমানে জিহাদের ব্যাপারে নানা ধরনের বিতর্ক তৈরি হয়েছে। জিহাদ কী, এর উদ্দেশ্য কী এবং এর পেছনের কারণ কী ইত্যাদি এসব ব্যাপারে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। রাসূলুল্লাহর জীবন দেখলে এই প্রতিটি প্রশ্নের দ্ব্যর্থহীন জবাব পাওয়া সম্ভব। জিহাদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘প্রচেষ্টা’, এর মানে হলো ‘সংগ্রাম বা চেষ্টা করা'। কিন্তু ইসলামে এ শব্দটি একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। আরবিতে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোর আভিধানিক অর্থ একরকম কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় শব্দগুলোর ভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন: আরবি শব্দ ‘সালাত’ এর আভিধানিক অর্থ হলো ‘দুআ’। কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় সালাত বলতে দুআ বোঝায় না, বরং বিশেষ একটি ইবাদাত বোঝায় যা মুসলিমরা দৈনিক পাঁচবার আদায় করে থাকে। তেমনিভাবে যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা হলেও ইসলামি পরিভাষায় যাকাত হলো একটি বিশেষ ইবাদাত, বছরান্তে সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে দান করা। এভাবেই ইসলাম পুরনো শব্দকে নতুন অর্থে সংজ্ঞায়িত করে। তেমনি জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ 'প্রচেষ্টা' হলেও যেকোনো প্রকার প্রচেষ্টাকে, এমনকি হোক তা ইসলামের পথে, তাকে জিহাদ বলে গণ্য করা হয় না। বরং সালাত বা যাকাতের মতো জিহাদ শব্দ দ্বারাও একটি বিশেষ ইবাদাতের কথা বোঝানো হয়।

তাই ইসলামি পরিভাষায় শব্দটির অর্থ হলো যারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের বিরুদ্ধাচারণ করে অর্থাৎ যারা আল্লাহর শত্রু তাদের বিরুদ্ধে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে যুদ্ধ করা। চারটি সুপ্রতিষ্ঠিত মাযহাবের সংজ্ঞা অনুযায়ী জিহাদমানে হলো আল্লাহর পথে আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চ করার জন্য যুদ্ধ করা।আল্লাহ আযযা ওয়াজালের পথে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সকল যুদ্ধ হলো অন্যায় ও অসত্যের পক্ষে যুদ্ধ। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে সকল প্রকার রক্তপাত নিষিদ্ধ, শুধু ব্যতিক্রম হলো জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। এর পক্ষে দলীল হলো,

"যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফর করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।" (সূরা নিসা, ৪:৭৬)

এই আয়াতে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সকল যুদ্ধকে দুইভাগে ভাগ করেছেন, একটি যুদ্ধ হলো আল্লাহর পথে ঈমানদারদের যুদ্ধ এবং অপরটি তাগুতের পক্ষে কাফিরদের
যুদ্ধ। সংক্ষেপে তাগূত হলো সেই সত্তা বা উপাস্য যাকে আল্লাহর পাশাপাশি ইবাদাত করা হয় অথবা সেই সীমালঙ্ঘনকারী যে নিজেকে এমন আনুগত্য বা কর্তৃত্বের আসনে
দাবি করেছে যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহর রাস্তায় ঈমানদারদের যুদ্ধ একটি প্রশংসনীয় ইবাদাত। ইসলামের দৃষ্টিতে যে
কোনো যুদ্ধের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর দ্বীনকে সুসংহত করা। এই কারণে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধের বৈধতা ইসলামে নেই। ইসলামে জিহাদের একটাই উদ্দেশ্য, তা হলো শুধুমাত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' – এর জন্য যুদ্ধ, একমাত্র এই যুদ্ধই হলো ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ।
আল্লাহ তাআলা হলেন খালিক্ব, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, তাই বৈধতা ও অবৈধতাকে সংজ্ঞায়িত করার অধিকার একমাত্র তাঁর। যে কোনো আইনকে বৈধতা এবং
অগ্রাধিকার দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। উদাহরণস্বরূপ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সপ্তাহের ৭টা দিনই সমান, কিন্তু আল্লাহ আযযা ওয়াজালের কাছে শুক্রবার সপ্তাহের বাকি দিনগুলোর চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। ভৌগলিক বা সৌর ক্যালেন্ডারের হিসেবে রামাদান মাসের সাথে অন্যান্য মাসের কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা অন্যান্য মাসের চেয়ে এই রামাদান মাসকে অধিক পছন্দনীয় মাস হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। ঠিক একইভাবে তিনি জিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনকে পছন্দ করেছেন, এ দশদিনের আমলগুলোর জন্য বিশেষ পুরস্কার নির্ধারণ করেছেন। আবার
রামাদানের শেষ দশ রাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই শেষ দশ রাতের বিজোড়

রাতগুলোর মধ্য থেকে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল লাইলাতুল কদর নির্ধারণ করেছেন যেটি বছরের শ্রেষ্ঠতম রাত। যেকোনো কিছুর পবিত্রতা ও যেকোনো কাজের বৈধতা প্রদানের মালিক কেবল আল্লাহ আযযা ওয়াজাল।

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে অন্য সব কিছুর দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার দাসে পরিণত করা। সুতরাং সৃষ্টির দাস না হয়ে বরং

মানুষ সৃষ্টিকর্তার দাস হবে – এটাই মানুষের জন্য সাজে, কেননা, মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা এবং সৃষ্টির সেরা হয়ে সে আরেক সৃষ্টির ইবাদাত করতে পারে না। জিহাদের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো মুসলিম-অমুসলিম সকলকে ইসলামের কল্যাণময় শাসনের ছায়াতলে নিয়ে আসা। ইসলামে কাউকে মুসলিম হওয়ার জন্য বাধ্য করা হয় না, তবে

ইসলামি ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে বাধ্য করা হয় যাতে করে মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য বুঝতে পারে এবং ইসলাম গ্রহণে উৎসাহী হয়। রাসূলুল্লাহ

বলেছেন আল্লাহ সেইসব লোকদের দেখে অভিভূত হন যাদেরকে

শেকলবদ্ধ করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। একজন আলিম এই কথার ব্যাখ্যায়

বলেছেন, এরা হলো সেসব লোক যাদেরকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইসলামের মধ্যে প্রবেশ

করানো হয়েছে এবং এর ফলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে।

গড়পড়তা মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে খুব একটা চিন্তিত নয়, হোক সে মুসলিম বা

অমুসলিম। রাসূলুল্লাহ যখন মক্কাবাসীদের ডেকে বলেছিলেন, 'আমি এসেছি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করতে তখন আবু লাহাব রাসূলুল্লাহকে বলেছিল, ধ্বংস হোক তোমার হাত। এসব অনর্থক আলাপ করার

জন্যই কি তুমি আমাদের ডেকেছ?"

আবু লাহাবের বিরক্তির কারণ হলো সে দুনিয়া কামানো বন্ধ করে এসেছিল এই ভেবে

যে, রাসূলুল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলবেন। রাসূলুল্লাহর বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল

সত্যি, কিন্তু আবু লাহাবের কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি, কারণ সেখানে দুনিয়ার লাভের কোনো কথা নেই। তাই যখন আবু লাহাব দেখতে পেল যে, রাসূলুল্লাহ সবাইকে তাওহীদের পথে ডাকছেন তখন সে খুব রেগে গেল। ওই সময়ই আল্লাহ

তাআলা সূরা আল-মাসাদ (১১১:১-৫) নাযিল করেন।

জিহাদ হলো এমন একটি পন্থা যা মানুষকে ইসলামকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে বাধ্য করে। মাক্কী জীবনের ১৩ বছরের দাওয়াতী কার্যক্রমে খুব অল্প লোকই মুসলিম হয়েছিল, কিন্তু যখন সাহাবারা মদীনায় এসে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ শুরু করলেন এবং লোকেরা ইসলামের ছায়ায় আসলো তখন তারা তাদের কথা গুরুত্বের সাথে নিতে বাধ্য হলো, কারণ

তখন তাদের হাতে কর্তৃত্ব ছিল। তাঁরা শাসনক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন বিধায় এই দাওয়াহ অনেক কার্যকরী হয়েছিল।

মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল।

যেখানে মক্কায় ১৩ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহর সাথে মাত্র ১০০ জনের মতো সাহাবা ছিলেন, সেখানে মদীনাতে প্রতি বছর হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতো। মক্কা বিজয়ের সময় অংশ নিয়েছিল দশ হাজার মুসলিম, বিদায় হাজ্জে

অংশ নিয়েছে নব্বই হাজার, আর যখন রাসূলুল্লাহ ইন্তেকাল করলেন তখন জানাযা পড়েছিল ১ লক্ষ চৌদ্দ হাজার মুসলিম। এই পরিসংখ্যানটি দেখিয়ে দেয় জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকরী হলে কত দ্রুত ইসলাম মানুষের মাঝে ছড়িয়ে

পড়ে। জিহাদের হুকুম নাযিল হয়েছে কয়েকটি ধাপে, ইবনুল কায়্যিম তাঁর যা'দ-উল-মাআদ গ্রন্থে বলেছেন প্রাথমিক যুগে জিহাদ নিষিদ্ধ ছিল, জিহাদ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি। রাসূলুল্লাহ তখন মুসলিমদের ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন। এরপর তাদেরকে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয় তবে তা বাধ্যতামূলক ছিল না; নিছক অনুমতি দেওয়া হয়।

"যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।" (সূরা হাজ্জ, ২২:৩৯)

পরবর্তী পর্যায়ে ধাপে তাদেরকে আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়।

"আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা বাক্বারা, ২:১৯০)

অবশেষে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দিলেন। এরপর সর্বশেষ ধাপের নির্দেশ এল এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা উম্মাহর জন্য চূড়ান্ত বিধান প্রকাশ করলেন। এই ধাপে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাঃ

সমস্ত কাফিরদেরদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

...আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে..." (সূরা তাওবাহ, ৯: ৩৬)

এ সম্পর্কিত একটি হাদীস রয়েছে যা ২০ জনেরও অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি হলো,

ইবন উমার থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেন,

'আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আর তারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর ওপর ন্যস্তা

গাজওয়া ও সারিয়া:-

রসূল সাঃ) যেসব অভিযানে নিজে উপস্থিত ছিলেন সেগুলো কে গাযওয়া বলে। যে অভিযান গুলোতে বিশেষ বিশেষ সাহাবীর নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করেছেন সেগুলোকে সারিয়া বলে। গাজওয়া মোটন ২৩ টি এবং সারিয়া ৪৩ টি।

উবাইদা ইবনে হারিসের নেতৃত্বে অভিযান (সারিয়া):-

১ম হিজরির শাওয়াল মাসে রসূল (সাঃ)

আবু সুফিয়ানের সাথে মোকাবেলা করার জন্য উবাইদা ইবনে হারিসের নেতৃত্বে ৬০ অথবা ৮০ জনের অশ্বারহী বাহিনী পাঠান এখানে কোনো যুদ্ধ হয়নি। শুধু সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস একটি তীর নিক্ষেপন করেন। এটাই ছিল কাফেরদের প্রতি ইসলামি বাহিনীর প্রথম তীর নিক্ষেপ।

কিবলা পরিবর্তন:-

রসূল (সাঃ) মদীনায় আগমনের ১৮ মাস পর শা'বান মাসে বাইতুল মুকাদ্দাস এর পরিবর্তে কাবা কে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের কিবলা হিসেবে নির্ধারণ করেন। কিবলা পরিবর্তনের প্রসঙ্গে ইহুদিদিরা মন্তব্য করলো " যদি প্রথম কিবলা ঠিক হয় তাহলে নতুন কিবরা বরারব ইবাদত করে তোমাদের কোনো কাজে আসবেনা।আর যদি দ্বিতীয় কিবলা ঠিক হয় তাহরে তো তোমাদের এতদিনের ইবাদত সব বিফলে গেল " ইহুদিদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তায়ালা একটি আয়াত নাজিল করেন।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَي النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰي عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَي الَّذِيْنَ هَدَي اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের উপর। আর যে কিবলার উপর তুমি ছিলে, তাকে কেবল এ জন্যই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে আমি জেনে নেই যে, কে রাসূলকে অনুসরণ করে এবং কে তার পেছনে ফিরে যায়। যদিও তা অতি কঠিন (অন্যদের কাছে) তাদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন এবং আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু।(২:১৪৩)

ঐতিহাসিক বদর :-

মদীনা থেকে ৮০ মাইল দূরের একটি কূপের নাম বদর। ঐ কূপের পাশ্ববর্তী স্থানে বদর যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

কুরাইশদের গর্বাহংকার প্রভাব প্রতিত্তির মূল ভিত্তি ছিল সিরিয়ায় ব্যবসা বানিজ্য কে কেন্দ্র করে। একজন রাজনৈতিক ধারা অনুযায়ী অপরিহার্য ছিল তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে নির্মূল করার জন্য তাদের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ধারাকে বন্ধ করে দেওয়া।

একবার কুরাইশদের একটি বাণিজ্যক কাফেলা সিরিয়া হতে প্রত্যাবর্তন করছিলা।রসূল (সাঃ) সে বিষয়ে জানতে পারলেন। ২য় হিজরির **১২** ই রমযান **৩১৩** জন মুজাহিদ ও আনসার সাহাবিদের নিয়ে যাএা শুরু করলেন। পথিমধ্যে রাওয়া নামক স্থানে যাএা থামালেন। ওদিকে কুরাইশ কাফেলার সরদারের কাছে উক্ত বিষয়ের সংবাদ পৌঁছে গেল। তারা সে রাস্তা ত্যাগ করে নদীর উপকূল দিয়ে চলতে লাগলো। তারা সঙ্গে সঙ্গে একজন অশ্বারোহীকে মক্কায় পাঠায় যাতে কুরাইশরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে এবং বাণিজ্যিক কাফেলাকে রক্ষা করে । কুরাইশরা প্রথম থেকেই মুসলমান দেরকে সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করছিল।এ সংবাদ মক্কায় পৌঁছা মাএ ৯৫০ জনের বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের মোকাবেলার জন্য রওনা হলো।

বদরে আল্লাহর সাহায্য :-

আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মুসলমানদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাই তিনি এমন উপায় সৃষ্টি করেদিলেন যে, তখনই বৃষ্টি বর্ষিত হলো । তাতে বালুকণাময় জমীন

শক্তহয়ে গেল। সকল বাহিনী তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলেন । পানির পাত্র সমূহ পূর্ণ করে নিলেন এবং চোবাচ্চা বানিয়ে অবশিষ্ট পানি আটকিয়ে রাখলেন । অপরদিকে বৃষ্টির পানিতে কাফেরদের জমীনে এমন কাঁদা সৃষ্টি করল যে, তাতে চলাফেরা করা বেশ কষ্টকর হয়ে গেল । উভয় বাহিনী যখন সামনা সামনি অবস্থান নিল তখন নবী করীম সা. যুদ্ধের

কাতার ঠিক করার জন্যে স্বয়ং উঠে দাঁড়ালেন। আর আল্লাহর এ বাহিনী এক সুদৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে গেলেন ।

বদরে কুরাইশের প্রসূতি:

১০০০ পদাতিক ৭০০ উষ্ট্রারোহী ৩০০অশ্বারোহী ১৩জন খাদ্য ব্যবস্থাপনায়। কুরাইশদলে সেনাপতি উতবা বিন রাবিআ।

মুসলিম বাহিনীর প্রসুতি :-

৩১৪ জন সাহাবী , ৭০টি উট ২টি ঘোড়া। বালক অক্ষমদের বাদ দিলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০৭ অথবা ৩০৩ জন। এদের মধ্যে ৮৩ জন মুহাজির ৬১ জন আওস বাকি সৈন্য খাজরাজ গোত্রের।

বদরে শহীদঃ-

মোট ১৪ জন, ডজন আনসার ৮ জন মুহাজির।

কুরাইশের মৃত্যু সংখ্যা:-

৭০ জন বন্দী ৭০ জন নিহত হয় মোট ১৪০ জন । বদর যুদ্ধের ৭ দিনের মধ্যে অভিসপ্ত আবু লাহাবের কঠিন রোগে মৃত্যু হয়। উহুদ যুদ্ধ ৩য় হিজরির ১৯ শাওয়াল উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উহুদ পাহাড়ের পাশে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়

উহুদ যুদ্ধ :-

৩য় হিজরির ১৯ শাওয়াল উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উহুদ পাহাড়ের পাশে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

সংক্ষিপ্ত কারণ :-

বদর যুদ্ধে পরাজিত মুশরিকরা পূর্ণ ১ বছর পর যখন তাদের কিছুটা ক্ষয়ক্ষতিকাটিয়ে উঠলো তখন তাদের মনে প্রতিশোধ গ্রহনের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। এ তারা এবার গুরুত্বের সাথে মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করলো কুরইশরা চাচ্ছিল বদর যুদ্ধের গ্লানি মুছে যায় আরব উপদ্বীপের সবাই কুরাইশদের সমীহ চোখে দেখতো কিন্তু মুসলমানদের উত্থান তাদের দীর্ঘ্যদিনের একচ্ছত্র আধিপত্যকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে দেয়।তাই আরেকটি যুদ্ধে মুসলমানদের হারানোর মাধ্যমে তারা এ আধিপত্য ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠে।

কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি:-

তাদের সৈনসংখ্যা ছিল ৩০০০ নারী ছিল ১৫ জন মতান্তরে ২৪ জন উট ছিল ৩০০০ টি ঘোড়া ২০০ মতান্তরে ১০০টি লৌহবর্ম ৭০০ টি ডান দিকের ঘোড় সওয়ার বাহিনীর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ বামদিকের সেনাবাহিনী ইকরিমা বিন আবি জাহল পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যা।তীরন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বারিয়াহ। যুদ্ধের পতাকা ছিল বনু আব্দুর দারের হাতে। মুশরিকদের যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যয় হয় ৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা।

মুসলমানদের উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতিঃ-

রাসূল সাঃ তার সেনাবাহিনীকে ৩ ভাগে ভাগ করেন প্রথম বাহিনীর পতাকা দেয়া হয় মুসআব বিন উমায়ের কে। দিত্বীয় কবিলায়ে আনসার বাহিনীর পতাকা দেয় হয় উসাইদ বিন হুযাইদকে।তৃতীয় কাবীলামে খাজরাযেরবাহিনীর পতাকা দেয় হুবার ইবনে মুনজিরকে। সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০০০, বর্ম পরিহিত ১৫০ জন ঘোড়সওয়ার ৫০ জন।

শহীদের সংখ্যা:-

মুসলমানদের শহীদের সংখ্য ৭০ জন খাজরায গোত্রের ৪১জন আউস গোত্রের ৪জন মুহাজির ৪ জন ইহুদি ১জন উহুদ যুদ্ধে রসূল সাঃ এর চাচা হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব মর্মান্তিক ভাবে শহীদ হন। উহুদ যুদ্ধে রসূল সাঃ দাত মুবারক শহীদ হয়।

কুরাইশদের পরাজয় এবং মুসলমান তীরন্দাজদের ভুল সম্পর্কে কুরআন:-

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤي اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

আর আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেন, যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে তাঁর নির্দেশে। অবশেষে যখন তোমরা দুর্বল হয়ে গেলে এবং নির্দেশ সম্পর্কে বিবাদ করলে আর তোমরা অবাধ্য হলে তোমরা যা ভালবাসতে তা তোমাদেরকে দেখানোর পর। তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া চায় আর কেউ চায় আখিরাত। তারপর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহশীল।(৩:১৫২)

খন্দক্বের যুদ্ধ :-

হিজরি ৫ম বর্ষের শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। বনু নাযির গোএ কে মদিনা থেকে বের করে দেয়ার পর তারা তাদের সম্বল নিয়ে আশ্রয় নিলো খাইবারে তারা বিভিন্ন গোএ সহ মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করে।এই উদ্দেশ্যে বনু নাযীরের ১০,০০০ এর মধ্যে বনু গাফতানের সৈন্য ৬০০০,কুরাইশ ও তাদের মিএ ৪০০০।

রসুল সাঃ এ খবর পেয়ে সাহাবীদের পরামর্শক্রমে মদীনার উত্তর দিকে পরীখা খনন শুরু করেন প্রতি ১০ জন সাহাবী ৪০ হাত করে পরীখা খনন করেন।পরীখা খননের পরামর্শ দের সালমান ফারসি রাঃ। পরিখাটি ছিল গভীরতায় ৫ গজ ও চওড়াতে ৫ গজ। খনন করতে ৬ দিন সময় লেগেছিল। পরিখা পার হওয়ার জন্য আবু সুফিয়ানের যে তিন জন নেতা প্রবল চেষ্টা করে তারা হল : ১। আমর বিন আবদ উদ ২। ইকরামা বিন
আবু জাহল ৩। দিরার বিন খাত্তাব। আমর পরিখা পার হয়ে উঠলে সম্মুখ যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর হাতে নিহত হয়। যখন শত্রুগণ বুঝতে পারলো শক্তি
দ্বারা হযরত (সা)-কে ধ্বংস করতে পারবে না তখন তারা অপকৌশল ও
বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিল। ইহুদী হুয়াই বিন আখতাব বানু কুরাইজা
গোত্রের নেতা কাব বিন আসাদকে হযরত (সা)-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা
করতে প্রলুব্ধ করে । মদীনা শত্রু দ্বারা ২৭ দিন অবরোধের পর রাত্রে প্রচন্ড বেগে ঝড় ও প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। বিদ্যুৎ চমকানিতে শত্রু সৈন্য পালিয়ে মহান আল্লাহ শত্রু বিতাড়িত করে নবীকে বিজয়ী করে দিলেন।

"আল্লাহ অবিশ্বাসীদের তাদের ক্রোধসহ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন যুদ্ধে বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান পরাক্রান্ত" (সূরা আহযাব : ২৫)

বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বানু কোরাইজা গোত্রের বিচারের দায়িত্ব পড়ল
তাদেরই অনুমোদিত লোক সাদ বিন মুয়াজের উপর। বিচারে সিদ্ধান্ত হল, যারা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের প্রাণদন্ড হবে। আর
তাদের ছেলে মেয়ে ও সম্পদ যুদ্ধলব্দ সম্পদ হিসাবে ভাগ হবে। বিচারে ৬০০ লোকের প্রাণদন্ড হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি:-

প্রায় ছয় বছর কা'বা থেকে দূরে থেকে রাসূলের কা'বার কাছে যাওয়ার তীব্র বাসনা জেগে উঠলো। তিনি স্বপ্নে দেখলেন তিনি আর সাহাবিরা একসাথে কা'বার চতুর্দিকে তাওয়াফ করছেন। তাওয়াফ শেষে কেউ কেউ মাথা মুণ্ডন করেছেন, আবার কেউ কেউ চুল ছেঁটে ছোট করেছেন। স্বপ্ন দেখার পর রাসূল মুসলিমদের তাঁর সাথে উমরা করার আহবান জানালেন।

মক্কায় যাওয়ার জন্যে, আল্লাহর ঘরকে এক নজর দেখার জন্যে সাহাবিরাও উতলা হয়ে উঠলেন।

সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট:-

৬ষ্ঠ হিজরির যুলকাদা মাসে রসূল সাঃ মক্কা গমনের পরিকল্পনা করেন এবং উমরার বাঁধেন রসূল সাঃ এর সাথে ছিলেন ১৪,১৫ শ সাহাবী। হুদায়বিয়া মক্কা থেকে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত একটি কূপের নাম রসূল সাঃ সেখানে যাএা বিরতি করেন সেখানে শুষ্ক একটি কূপ ছিল রসূলের মোজেজায় তাতে পানি পূর্ন হয়ে উঠলো সকলে তৃপ্তি সহকারে পান করলেন। সেখানে পৌছানোর পর রসূল সাঃ উসমান রাঃ কে মক্কায় পাঠান এ কথা নিশ্চিত করার জন্য যে, রসূল সাঃ শুধু মাএ বায়তুল্লাহ যিয়ারত এবং উমরা পালনের উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্যে নেই। উমসান রাঃ মক্কায় পৌঁছারে কাফেররা তাকে বন্ধি করে রাখে। এদিকে মুসলমানদের মধ্যে সংবাদ রটে গেছে যে,কাফেররা উসমান রাঃ হত্যা করে ফেলেছে।রসূলের কাছে এ সংবাদ পৌঁছারে তিনি বাবুল বৃক্ষের নীচে সাহাবায়ে কেরাম হতে জিহাদের বায়আত নেন।পবিত্র কুরআনে এর আলোচনা এসেছে বায়আতকে বায়আতে রিদওয়ান বলা হয়।পরবর্তীতে জানা গেল যে, উসমান রাঃ এর হত্যার কথাটি সঠিক নয় বরং কুরাইশ রক সুহাইল ইবনে আমর কে সন্ধির শর্ত চূড়ান্ত করতে পাঠান। সন্ধির শর্তাবলি চূড়ান্ত গরে সন্ধিনামা লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ১০ বছরের জন্য এ সন্ধি স্থির হয়।

সন্ধির মূল ধারাগুলো নিম্নরূপ:-

-উভয় পক্ষ দশ বছরের শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ থাকবে। এই দশ বছরের মধ্যে কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না। শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকবে।

-যদি কুরাইশদের কেউ তার গোত্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মাদের দলে
যোগ দেয়, তাহলে তাকে কুরাইশদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।

-যদি মুহাম্মাদের দেওয়া হবে না।
দলের কেউ কুরাইশদের সাথে যোগ দেয়, তাহলে তাকে ফিরিয়ে

-উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি ভালো নিয়ত রাখবে।

-কোনো প্রকার চুরি বা বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

-যার ইচ্ছা সে মুহাম্মাদের সাথে জোট বাঁধতে পারবে আর যার ইচ্ছা সে কুরাইশের সাথে জোট বাঁধতে পারবে।

-মুহাম্মাদ সাঃ এবং সাহাবিরা এই বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই ঘরে ফিরে যাবে। পরবর্তী বছরে কুরাইশরা মক্কা খালি করে চলে যাবে, যেন রাসূলুল্লাহ এবং তাঁর সাহাবিরা মক্কায় প্রবেশ করতে পারেন এবং তারা তিন দিন অবস্থান করতে পারবেন। এই সময়টায় ততটুকু অস্ত্রশস্ত্র রাখা সংগত হবে, যতটুকু অস্ত্রশস্ত্র সাধারণত একজন মুসাফির তার সাথে রাখে, এর বেশি নয়।

খাইবার:-

মদীনায় ইহুদিদের মধ্য হতে বনু নাযীর গোএ খাইবার গিয়ে বসতী স্থাপন করলে খাইবার ইহুদিদের কেন্দ্রস্থলে পরিনত হয় তারা পাশ্ববর্তী সকল আদিবাসীদের কে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে শুরু করে। ৭ম হিজরি মুহাররম বা জুমাদিউল উলা মাসে রসূল সাঃ ৪০০ পদাতিক এবং ২০০ অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তাদের সাথে জিহাদের উদেশ্যে যাএা শুরু করেন সংঘর্ষের পর আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের বিজয় দান করেন ইহুদিদিরা পরা:-জিত হয়।

ফাদাক বিজয়:-

খাইবার বিজয়ের রসূল সাঃ ফাদাকের ইহুদিদের নিকট একটি পএ প্রেরণ করেন তারপর তারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে।

৭ম হিজরিতে রসূল সাঃউমরায়ে কাযা আদায় করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে উমরাহ কাযা হয়েছিল।

মুতার যুদ্ধ :-

৮ম হিজরীতে মুতার যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

সিরিয়ার বালাকা শহরের উপকণ্ঠে বায়তুল মুকাদ্দাস হতে প্রায় ২ মানযিল দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম মূতা, এখানে প্রথমে ইহুদি এবং মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। যুদ্ধের কারন হলো,রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে বুসরার গভর্ণর ছিল আমর ইবনে শুরাহবীল।সে রসূল সাঃ এর প্রেরিত দূত হযরত হারেস ইবনে উমাইর রাঃ কে হত্যা করে।

এ সংবাদ জানার পর রসূল সাঃ ৮ম হিজরীর মধ্যেভাগে ৩০০০ সাহাবীর বাহিনী মূতা অভিমূখে প্রেরণ করেন।

সাহাবীদের বাহীনি যখন মূতার নিকটবর্তী পৌঁছান তখন রোমানগন এ ব্যাপারে অবগত হলে দেড়লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী তাদের মোকাবেলার জন্য বের হয়। কয়েকদিন যুদ্ধ হওয়ার

পর আল্লাহ তায়ালা দেড়লক্ষ কাফের সৈন্যের অন্তরে মুসলমানদের প্রতি এতো ভীতি সঞ্চার করেদেন যাতে তারা পালানো ছাড়া আর কোনো রক্ষার উপায় দেখলো না।

মক্কা বিজয় :-

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে যে সব শর্তাবলী স্থির হয়েছিল মুসলমানগণ তা পূর্ণরূপে পালন করে আসছিলেন। কিন্তু ৮ম হিজরীতে কুরাইশরা উক্ত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে । নবী করীম সা. একজন দূতের মাধ্যমে কুরাইশদের নিকট হুদায়বিয়ার সন্ধি নবায়ন করার জন্যে প্রস্তাব পেশ করেন এবং পরিশেষে লিখে দিলেন যে, এ সকল শর্ত যদি গৃহীত না হয় তাহলে আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গের ঘোষণা দিচ্ছি। কুরাইশরা সন্ধি ভঙ্গের দিকটিই পছন্দ করল । অবশেষে আল্লাহর রাসূল সা. জিহাদের জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। সে মোতাবেক ৮ম হিজরীর ১০ই রমাযান মঙ্গলবার আসরের নামাযের পর ১০,০০০ সাহাবীর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে নবী করীম সা. মদীনা হতে বের হন । হুদাইয়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে মাগরিবের ওয়াক্ত হলে সেখানে ইফতার করেন। মক্কায় পৌঁছে হযরত খালেদ ইবনে অলীদ রা. কে একদল সৈন্য দিয়ে উঁচু দিক থেকে শহরে প্রবেশের নির্দেশ দেন এবং বলেন- যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হয় তোমরা ও তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবেনা । এদিকে রাসূলে সা. অপর দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং সাধারণ ঘোষণা করে দিলেন যে, “যারা মসজিদে প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ। যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ । যারা নিজ গৃহে দরজা বন্ধ করে থাকবে তারা নিরাপদ।” তবে মাত্র ১১জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলার খুন ক্ষমা করলেন না। কারণ এদের অস্তিত্বই বিভিন্ন ধরণের কলহের উৎস ছিল। এদের সকলেই বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। তন্মধ্য হতে অধিকাংশই মক্কা বিজয়ের পরে মদীনায় পৌঁছে মুসলমান হয়ে যায় ।

২০ শে রমাযান শুক্রবার আল্লাহর রাসূল সা. তাওয়াফ কাজ সম্পন্ন করেন। তখনো পর্যন্ত কা'বা গৃহের চতুর্দিকে ৩৬০ টি মুর্তী রাখা ছিল। রাসূল সা. এর হাতে একটি শলাকা ছিল । তিনি যখন কোন মূর্তীর নিকট দিয়ে অতিক্রম কালে তা দিয়ে ইশারা করছিলেন- অমনি তা উপুড় হয়ে ভূপাতিত হয়েছিল । তখন আল্লাহর রাসূলের যবানে এ আয়াত মোবারক উচ্চারিত হচ্ছিল।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ
كَانَ زَهُوقًا

অর্থ: আর বলো, "সত্য এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই

হুনাইনের যুদ্ধ :-

মক্কা বিজয় হলো। ইসলামের বিরুদ্ধে সবচাইতে শক্তিশালী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তি ছিল কুরাইশরা। মক্কা বিজয়ের সাথে তাদের পতন ঘটে। কিন্তু আরও একটি শক্তি
তখনও ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হিসেবে কাজ করছিল। তাদের কথা কুরআনেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

"আর তারা বলে, এ কুরআন কেন দুই জনপদের মধ্যকার কোনো মহান ব্যক্তির উপর নাযিল করা হলো না?" (সূরা ফুসসিলাত, ৪১: ৩১)

এই দুই জনপদ হলো মক্কা আর তাইফ। আর অবশিষ্ট এই বিরোধী শক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল হাওয়াযিন, সাকিফ এবং আরও কিছু গোত্র। এরা হুনাইনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। সাকিফ গোত্র তাইফে বসবাস করতো। এটি ছিল হাওয়াযিনের একটি শাখা।
হাওয়াযিন ছিল কুরাইশের মতোই অন্য অনেকগুলো উপগোত্রের মূল গোত্র।
হাওয়াযিনরা কুরাইশদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সেই জাহিলিয়াতের যুগ থেকেই। এই দ্বন্দ্ব ছিল পুরোপুরি গোত্রীয় চেতনা থেকে উদ্ভুত। আল্লাহর রাসূলের মক্কা বিজয়ে হাওয়াযিনরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়, কেননা তাদের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে। কুরাইশ বংশের কেউ এসে তাদের ওপর ক্ষমতাবান হয়ে যাবে, এটা তারা মানতে পারছিল না। তারা স্পষ্টতই বুঝতে পারছিল যে, মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূলের পরবর্তী লক্ষ্য তাইফ। ভূ-রাজনৈতিক বিচারে সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ তাইফ ছিল মক্কার নিকটবর্তী সবচেয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। তাইফে এর আগে আল্লাহর রাসূল ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন তারা খুব বাজেভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের আচরণ তৎকালীন জাহিলিয়াতের মানদণ্ডেও প্রচণ্ড আপত্তিকর ছিল। আরবদের মধ্যে সহজাত যে ঔদার্য আর মেহমানদারিতার প্রচলন ছিল, তার ছিটেফোঁটাও তারা দেখায়নি। যখন মানুষকে মিথ্যা মাবূদদের পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর দিকে আহবান করা হয়, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক, ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ, স্বজাত্যবোধ গৌণ হয়ে যায়। তাওহীদ আর শিরকের দ্বন্দ্ব সবকিছুকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এটাই চিরন্তন বাস্তবতা। তারা সিদ্ধান্ত নিল মুসলিমরা আক্রমণ করার আগে তারাই মুসলিমদের ওপর হামলা চালাবে। মালিক ইবন আউফ আল-নাসরির নেতৃত্বে হাওয়াযিন, সাকিফ, বনু হিলাল,বনু সাদ ইবন আবি বকরসহ বেশ কিছু গোত্র এক হলো। তবে কা'ব এবং কিলাব গোত্র তার ডাকে সাড়া দেয়নি। মালিক ইবন আউফ প্রায় বিশ হাজার যোদ্ধার সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী তৈরি করলো। রাসূলুল্লাহ তাদের এই সৈন্য সমাবেশের খবর শুনতে পেয়ে বারো হাজার সৈনিকের এক বাহিনী নিয়ে মক্কার বাইরে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এই

বারো হাজারের মধ্যে দশ হাজার সৈনিক মক্কা বিজয়ে অংশ নিয়েছিল। আর এরপর আত-তুলাকা থেকে আরও দুই হাজার সৈন্য যোগদান করে। মক্কা বিজয়ের পর ক্ষমা ও মুক্তিপ্রাপ্তদের আত-তুলাকা বলা হতো। অর্থাৎ, যেসব মক্কাবাসী মক্কা বিজয়ের পর মুসলিম হয়ে যায় তারা হলো আত-তুলাকা। এই অভিযান চলাকালীন সময়ে মদীনায় গভর্নর হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন আত্তাব ইবন উসাইদ ।

তাবুকের যুদ্ধ :-

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ৯ম হিজরীর মাঝামাঝি পর্যন্ত রসুল সা.

মদীনাতেই অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে সংবাদ পেলেন যে, মুতার যুদ্ধে পরাজিত রোমকরা মুসলমানদের সাথে পুনরায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদীনা হতে ১৪ মানযিল দূরে তাবূক নামক স্থানে বিপুল সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। রসূল সা. ও কাল বিলম্ব না করে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। তবে সে সময় দূর্ভীক্ষের দরুন মুসলমানগণ অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন। তদুপরি প্রচন্ড গরম পড়ছিল তখন। এতদ্বসত্বে আত্মত্যাগী সাহাবীগণ জিহাদের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন । এ উদ্দেশে চাঁদা গ্রহণ করলে হযরত আবু বকর আকবর রা. ঘরের সর্বস্ব সম্বল নবীজী সা. এর খেদমতে হাযির করলেন। হযরত উসমান রা. রণ সামগ্রীর এক বিশাল সহায়তা প্রদান করেন। ৯০০ উট এবং ১০০ অশ্ব ও এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। রজব মাসের কোন এক বৃহস্পতিবার রজনীতে ৩০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাবূক অভীমূখে যাত্রা করলেন ।

যুদ্ধের ময়দানে:-

তাবুকের যুদ্ধ ছিল রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোনো রোমান ব্যাটালিয়ন বা স্থানীয় আরব খ্রিস্টান কোনো বাহিনীর চিহ্নই দেখা গেল না। কোনো যুদ্ধই হলো না। কারণ রাসূলুল্লাহর আগমনের খবর রোমানদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। তাই তাদের আধুনিক সমরাস্ত্র আর বিরাট সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধের জন্য বের হয়নি। সম্মুখ সমরে মুখোমুখি হতে তারা ভয় পেল। রাসূল সাা.সেখানে অবস্থান করে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন কিন্তু কেউই এল না। সে সময়ে রাসূল সা. শাম ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি শহর দখল করে তাদের সাথে চুক্তি করেন ও জিযিয়া গ্রহণ করেন। ইবন ওয়ালিদকে পাঠান। রাসূল সা. খালিদকে বলেই দিয়েছিলেন, তুমি রাসূল সা. দাউমাতুল জান্দালের রাজা উকাইদকে বন্দী করে আনার জন্য খালিদ ওয়ালিদকে পাঠান রসূল সা. খালিদকে বলেই দিয়েছিলেন, দেখবে উকাইদ গাভী শিকারে ব্যস্ত।' হলোও তাই। সেদিন ছিল এক পূর্ণিমার রাত। উকাইদ দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিল গাভী শিকারের জন্য। খালিদ ইবন ওয়ালিদ তাকে আক্রমণ করে বন্দী করলেন। উকাইদ জিযিয়া দিতে রাজি হলো। জারবা আযরা, মাক্বনা এই অঞ্চলের খ্রিস্টানরা জিযিয়া দিতে রাজি হয় এবং ইসলামী শাসনের অধীনে চলে আসে। এই

ছোট ছোট রাজ্যগুলো ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়ায় ইসলামী সাম্রাজ্যের উত্তর সীমা সুরক্ষিত হয় এবং এই অঞ্চলটি রোমান ও মুসলিমদের মাঝে 'বাফার জোন' হিসেবে কাজ করে। এই রাজ্যগুলো যদিও ইতিপূর্বে রোমানদের অধীনস্থ ছিল, কিন্তু রোমানদের প্রতি তারা খুশি ছিল না। যে কারণে তারা বেশ সহজেই ইসলামের অধীনে চলে আসে। পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদার সময়ে এই অঞ্চলগুলো থেকে রোমান সাম্রাজ্যের ওপর সামরিক হামলা গুলো পরিচালনা করা হয়। তাবুকের যুদ্ধ ছিল আল্লাহর রাসূলের জীবনের সর্বশেষ বড় অভিযান। এই যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের জন্য একটি পরীক্ষা।

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন নবীর ওপর, অনুগ্রহ করেছেন
মুহাজির ও আনসারদের ওপর, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল। (এমনকি) যখন তাদের একটি দলের অন্তর বাঁকা পথে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল, অতঃপর আল্লাহ এদের সবার ওপর দয়া করলেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়।” (সূরা তাওবা, ৯:১১৭)

এই আয়াত আল্লাহর রাসূলের জীবনের সমাপ্তির ইঙ্গিত দেয়। কেননা ক্ষমা হলো এখন একটি ব্যাপার, যা সমাপ্তির দিকেই আসে। ইবাদাতের শেষ দিকেই আমরা সাধারণত ইস্তিগফার করি। তাই রাসূলুল্লাহ ও অন্যান্য মুসলিমদেরকে জানানো হচ্ছে যে আল্লাহ রাসূলুল্লাহকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আরও ক্ষমা করে দিয়েছেন সেই সব আনসার ও মুহাজিরদের যারা কঠিন সময়ে তাঁর সাথে ছিলেন।

বিদায় হজ্জ:-

রাসূল সা. হিজরতের দশম বছরে হজ্জ করেছিলেন। এই হজ্জকেই বলা হয় বিদায় হজ্জ। এই হাজ্জেই রাসূলুল্লাহ মুসলিম উম্মতের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত ভাষণ প্রদান করেন। সকল মুসলিম সম্মিলিতভাবে শেষবারের মতো রাসূলুল্লাহকে শোনার সুযোগ পায়। মদীনা থেকে তিনি এই একবারই হজ্জ করেছিলেন।

দেখার ও রাসূল সা. উটে চড়ে হজ্জ করেছিলেন। তাঁর এই হাজ্জে কোনো বিলাসিতা ছিল না, নিতান্তই সাদাসিধেভাবে তিনি হজ্জ সম্পন্ন করেছিলেন। সেই হজ্জ এখনকার মতো ভিআইপি হজ্জ ছিল না। আল্লাহর রাসূল মুসলিমদের হজ্জের নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করলেন, এরপর যখন তিনি আরাফাতের ময়দানে তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন,

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের
উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে

পছন্দ করলাম ইসলামকে।" (সূরা মায়িদা, ৫:৩)

এই আয়াত নাযিল হলে সাহাবিরা কাঁদতে শুরু করেন। তারা বুঝতে পারলেন আল্লাহর রাসূল আর বেশিদিন তাদের মাঝে থাকবেন না। উমারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি কেন কাঁদছেন। তিনি উত্তর দেন, "যখন কোনো কিছুর উত্থান ঘটে আর সেটা পরিপূর্ণতা লাভ করে, এরপর তার কেবল পতনই সম্ভব।" উমার বলতে
চাচ্ছিলেন, ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। মুসলিমরা এই শ্রেষ্ঠত্ব কিছুকাল ধরে রাখবে, এরপর আস্তে আস্তে তাদের পতন হবে। এজন্যই আমরা বিশ্বাস করি, সাহাবিদের যুগ ছিল শ্রেষ্ঠ সময়, সেই স্বর্ণযুগ আর কখনো ফিরে আসবে না।
মাসজিদ আল-হারামে এসেই আল্লাহর রাসূল কালো পাথর স্পর্শ করে চুমু খেলেন। এরপর তাওয়াফ শুরু করলেন। প্রথম তিনবারের তাওয়াফ ছিল দ্রুতগতির তাওয়াফ,আর পরের চারবার ছিল সাধারণ গতিতে। এরপর তিনি কুরআনের একটি আয়াত পাঠ
করলেন,

"আর স্মরণ করো, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং (আদেশ দিলাম যে,) তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো। আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকুকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র করো।" (সূরা বাক্বারাহ, ২: ১২৫)

এরপর তিনি মাক্বামে ইবরাহীমকে তাঁর আর কাবার মাঝে রেখে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি আবার কালো পাথর স্পর্শ করলেন, চুমু খেলেন। এরপর পাঠ করলেন সূরা বাক্বারাহ অন্য একটি আয়াত।

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে কিংবা উমরা করবে তার কোনো অপরাধ হবে না যে, সে এগুলোর তাওয়াফ করবে। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কল্যাণ করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ শোকরকারী, সর্বজ্ঞ।" (সূরা বাক্বারাহ, ২, ১৫৮)

এরপর আল্লাহর রাসূল সা. সাফা ও মারওয়ার মাঝে 'সাঈ' করলেন সাতবার। আল্লাহর রাসূল উরানাহ উপত্যকায় এসে সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, যেটা বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে পরিচিত। তিনি বললেন,

লোকেরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো! হয়তো আজকের পর আমি আর কখনো এখানে তোমাদের সঙ্গে একত্রিত হতে পারবো না।

আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর যেমন পবিত্র; তোমাদের জান, মাল, ইজ্জত কিয়ামত পর্যন্ত তেমনই পবিত্র। কারো কাছে যদি কোনো আমানত রক্ষিত থাকে, তাহলে সে যেন তা আমানতকারীর কাছে পৌঁছে দেয়। তোমরা অন্যের ওপর অত্যাচার করবে না, নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না। জেনে রেখো, জাহিলী যুগের সকল অপসংস্কৃতি আমার পায়ের নিচে। শুধু কাবাঘরের তত্ত্বাবধান ও হাজীদের পানি পান করানো ছাড়া। জাহিলিয়াতের সকল রক্তপণের দাবি বাতিল করা হলো। প্রথম যে রক্তপণের দাবি বাতিল করছি, তা হলো রবিয়া ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিবের রক্ত। সে শিশু অবস্থায় বনু সাদের দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।

জাহেলী যুগের সুদের প্রথা বিলুপ্ত করা হলো। তোমাদের কেবল মূলধনের ওপর অধিকার থাকলো। সর্বপ্রথম যে সুদ বাতিল করছি, তা হলো আমাদের বংশের আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল করা হলো।

নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নারীদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে, তেমনি পুরুষদের উপর রয়েছে নারীদের অধিকার। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর নির্ধারিত কালিমা বাক্যের মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছো। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা অপছন্দ করো এমন কাউকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো, তোমরা তাদের ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছেদের ভার বহন করবে ন্যায়সঙ্গতভাবে।

আমার পর তোমরা পরস্পর খুনোখুনিতে জড়িয়ে কুফরে পতিত হয়ো না। যারা সালাত আদায় করবে, তারা (পুনরায়) শয়তানের ইবাদাত করবে, এটা

শয়তান আশা করে না। কিন্তু সে তোমাদের মধ্যে বিবাদ করতে থাকবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। যদি বিকলাঙ্গ কোনো দাসও তোমাদের উপর নেতা নিযুক্ত হয় এবং সে তোমাদের আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী নেতৃত্ব দেয়, তাহলে তাঁকে শুনবে ও মানবে।

সাবধান! অপরাধী তার অপরাধের জন্য নিজেই দায়ী। সাবধান! পিতার অপরাধ সন্তানের ওপর বর্তায় না, না বর্তায় সন্তানের অপরাধ পিতার ওপরে।

জেনে রেখো, এ নগরে আর কখনো শয়তানের ইবাদাত হবে না, এ থেকে সে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তুচ্ছ ভেবে এমন অনেক কাজ তোমরা করবে, যা করলে সে খুশি হবে।

তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, রামাদান মাসে সিয়াম পালন করবে, যাকাত আদায় করবে ও তোমাদের নেতার আদেশ মেনে চলবে, তবে তোমরা জান্নাত লাভ করবে।

তোমাদের গোলাম ও অধীনস্থদের বিষয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। তোমরা যা খাবে, তাদেরকে তা খেতে দেবে। তোমরা যা পরবে তাদেরকেও সেভাবে পরতে দেবে।

জেনে রেখো, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। তোমাদের একের সম্পর্ক আরেকজনের জন্য বৈধ নয়। তবে কেউ স্বেচ্ছায়, খুশি মনে তার সম্পদ কাউকে দিয়ে দিলে সেটা ভিন্ন কথা। কাজেই নিজেরা নিজেদের ওপর জুলুম কোরো না। আল্লাহ তাআলা তোমাদের সম্পদের মিরাস নির্দিষ্টভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন। তার থেকে কম বেশি করবে না। সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো অসিয়ত বৈধ নয়। সন্তান যার বিছানায় জন্ম গ্রহণ করবে, সে তারই হবে। ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে প্রস্তরাঘাত। (অর্থাৎ সন্তানের জন্য শর্ত হলো তা বিবাহিত দম্পতির হতে হবে। ব্যভিচারীর সন্তানের অধিকার নেই)। যে সন্তান আপন পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা এবং যে দাস নিজের মালিক ব্যতীত অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানব জাতির অভিশাপ।

নিশ্চয়ই তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক। আরবের ওপর অনারবের এবং অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সাদার উপর কালোর আর কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে কেবল তাকওয়ার মাপকাঠিতে।

মনে রেখো, সকলকে একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হতে হবে। সে

দিন তিনি প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। তোমরা আমার পরে গোমরাহিতে লিপ্ত হবে না, পরস্পর হানাহানিতে মেতে উঠবে না। আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। আমার মাধ্যমে ওয়াহীর পরিসমাপ্তি হতে যাচ্ছে। আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি । যতদিন তোমরা এই দুটি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব ও অপরটি রাসূলের সুন্নাহ।
প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে আমার কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেয়। হতে পারে, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকবে যারা উপস্থিত শ্রোতার চাইতে আমার কথাগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবে।'

খুতবা শেষে আল্লাহর রাসূল সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন,
তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা তখন কী বলবে?

সাহাবিরা উত্তর দিলেন, "আমরা সাক্ষ্য দেবো, নিশ্চয়ই আপনি আপনার বার্তা পৌঁছেদিয়েছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমাদের আন্তরিক উপদেশ দিয়েছেন। এরপর আল্লাহর রাসূল সা.আকাশের দিকে আঙুল তুললেন, এরপর আবার মানুষের দিকে আঙুল দেখালেন, এরকম কয়েকবার করলেন আর বলতে থাকলেন,

'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো!"

জীবনের শেষ পর্যায়ে রসুল:-

আল্লাহর রাসূলের সীরাতের সফলতম সময় চলছিল। আল্লাহর রাসূলকে নবুওয়াতের যে মিশন দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, সে মিশনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়েছে। আজ থেকে তেইশ বছর আগে যে তাওহীদের বার্তা নিয়ে তিনি এসেছিলেন, সেই বার্তাকে লোকেরা এখন সাদরে গ্রহণ করেছে। আরব উপদ্বীপ থেকে শিরক বিতাড়িত হয়েছে, আল্লাহর ঘর কাবায় তাওহীদ প্রত্যাবর্তন করেছে। সমগ্র আরব ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছে, আরবের চারপাশে ইসলাম কড়া নাড়তে শুরু করেছে। আর আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূল এমন এক প্রজন্মকে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন যারা ইসলামের এই বিজয় মশাল পুরো বিশ্বে বহন করে নেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। দুনিয়ার বুকে মুসলিমদের জীবন কীভাবে

পরিচালিত হবে তার বাস্তব উদাহরণ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর রাসূল করেছেন, তাঁর বিদায় নেওয়ার সময়ও তাই ঘনিয়ে এসেছে।
আল্লাহর রাসূল সাঃ তাঁর ওপর আরোপিত গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন যে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আগে থেকেই বেশ কিছু আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

"আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। আপনার রব শীঘ্রই
আপনাকে এমন কিছু দেবেন যে আপনি খুশি হবেন।" (সূরা আদ দুহা, ৯৩)
দিনটা ছিল সোমবার। আল্লাহর রাসূল সেদিন আমাদের ছেড়ে চলে যান। কেমন ছিল সেই দিন? ফজরের ওয়াক্তে আবু বকর মুসলিমদের সালাত পড়াচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ ও তাঁর ঘরের পর্দা সরিয়ে মসজিদের ভেতর তাকালেন। তিনি চোখ ভরে তাঁর উম্মাহকে দেখছিলেন। তাঁর উম্মাহ সারিবদ্ধভাবে সালাহ আদায় করছে।
তাওহীদের যে বীজ তিনি রোপণ করেছিলেন, সেই চারাগাছ আজ সুবিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তাঁর দাওয়াহ সফল, তাঁর মিশন সম্পূর্ণ। মুসলিমরা আজ নিজেরাই জামাতবন্ধ হয়ে সালাত আদায় করছে। রাসূলুল্লাহর মন এক অপার আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। তিনি মুচকি হাসলেন। রাসূলুল্লাহর হাসিমুখ দেখে সাহাবিরাও খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। আনন্দের আতিশয্যে তাদের সালাত ভেঙে যাবার উপক্রম! আনাস ইবন মালিকের
বর্ণনায়,
আল্লাহর রাসূলের মুখ সেদিন যেন কুরআনের পাতার মতো ঝলমল করছিল।
অন্য বর্ণনায় এসেছে,
'তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক ফালি চাঁদ!"
আবু বকর রাসূলুল্লাহকে ইমামতিতে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিতে পেছনে
ফিরে আসছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ইশারায় জানিয়ে দিলেন তারা যেন নিজেরাই
সালাত আদায় করে নেন। এরপর রাসূলুল্লাহ পর্দা ফেলে আবার ভেতরে চলে গেলেন।
রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর উম্মাহর সর্বশেষ যে দৃশ্যটি দেখেছেন সেটি হলো সালাতের
জামাত। এই দৃশ্য দেখেই রাসূলুল্লাহর মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। নিশ্চয়ই
তাওহীদের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সালাহ।
রাসূলুল্লাহকে দাঁড়াতে দেখে সাহাবিরা ভাবলেন রাসূল সা. শারীরিক অবস্থারহয়তো উন্নতি হয়েছে। তাই আবু বকরঅনুমতি নিয়ে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে দেখা করতে আস-সুনহে চলে গেলেন, সেটা ছিল মদীনার কিছু দূরে।

সোমবারের ফজর সালাহ ছিল রাসূলুল্লাহর শেষ সালাহ। আইশার ভাই আবদুর রহমান তাদের ঘরে এলেন, তার হাতে একটা মিসওয়াক ছিল। রাসূলুল্লাহ সেই মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখে কিছু বলাও তখন কষ্টকর। আইশা তাঁর
চাহনি দেখেই বুঝতে পারলেন রাসূলুল্লাহ মিসওয়াকটি ব্যবহার করতে চাইছেন।
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কি এটা চান?” রাসূল সাঃ ইঙ্গিতে বললেন,
হ্যাঁ চাই। আইশা তখন মিসওয়াকটি তার ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে এর অন্য পাশ নরম করে রাসূলুল্লাহকে এগিয়ে দিলেন। আইশা বলেন, তিনি এমনভাবে
মিসওয়াক করছিলেন যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি একদম সুস্থ। জীবনের একদম
শেষ প্রান্তে এসেও রাসূলুল্লাহ মিসওয়াক ব্যবহারের সুন্নাহ ত্যাগ করেননি।
রাসূলুল্লাহর কষ্ট, যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। তাঁর কষ্ট দেখে ফাতিমা বলে উঠলেন,
“বাবার কতই না কষ্ট হচ্ছে!' সেই কষ্টের মুহূর্তেও তিনি মেয়ের কথার উত্তর দিলেন,
বললেন, ‘আজকের দিনের পর তোমার বাবার আর কোনো কষ্ট নেই মা!”
মৃত্যুর মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল শুয়ে ছিলেন আইশার কোলে মাথা রেখে। পানির পাত্রে হাত ভিজিয়ে বারবার নিজের মুখ মুছে বলছিলেন, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো
মাবূদ নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যু বড়ই কঠিন।' রাসূলুল্লাহ
সেরা সৃষ্টি, তাঁকেও মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। শেষ সময় ঘনিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ছিলেন সমগ্র মানবজাতির ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে সূরা নিসার একটি আয়াত পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করছিলেন, বলছিলেন,
'হে আল্লাহ! আমাকে অন্তর্ভুক্ত করো নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের
সাথে, যাদের আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন!
হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও! আমার ওপর রহম করো! আমাকে
সর্বোচ্চ সাথীর কাছে মিলিত করো!”
মৃত্যুর একেবারে শেষ মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল তাঁর তর্জনী উপরে তুলে বলছিলেন,
ফীর-রফিকুল আ’লা!
ফীর-রফিকুল আ’লা!
ফীর-রফিকুল আ'লা!
--
রাসূলুল্লাহর চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ইন্তেকাল করলেন, দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর সর্বোচ্চ সঙ্গী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে। জীবনেরনশেষ মুহূর্তেও উচ্চারণ করছিলেন তাঁর জীবনভর চেয়ে যাওয়া ইচ্ছার কথা

ওয়ালহিক্বনী বির- রফিক্বিল আ'লা আমাকে সর্বোচ্চ সঙ্গীর (আল্লাহ) সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিন।

রাসূল সাঃ এর দাফন:-

রাসূলুল্লাহর পরিবারের সদস্যরা রাসূলুল্লাহর গোসল ও দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন আল আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব, আলী ইবন আবি তালিব, আল ফাযাল ইবন আব্বাস, কুসাম ইবন আব্বাস, উসামা ইবন যায়েদ
এবং রাসূলুল্লাহর আযাদকৃত দাস শুকরান। আনসারী সাহাবি আওস ইবন খাওলি আলীকে বললেন, ‘আল্লাহর কসম এবং রাসূলুল্লাহর ওপর আমাদের হকের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে ভেতরে আসতে দিন।' তাকে ভেতরে আসতে দেওয়া হলো এবং
তিনি গোসলের সময় উপস্থিত ছিলেন।
আইশা বলেন, ‘গোসলের সময় তারা বললো, আমরা তো বুঝতে পারছি না,
রাসূলুল্লাহর গায়ের কাপড় খুলে গোসল দেবো, যেভাবে করে আমরা অন্যদের গায়ের কাপড় খুলে গোসল দিই, নাকি কাপড় রেখেই যেভাবে আছে সেভাবে গোসল দেবো। যখন তারা এটা নিয়ে বিতর্ক করছিল, তখন আল্লাহ তাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেন, সেই
তন্দ্রায় তাদের প্রত্যেকের মাথা ঢলে পড়লো। এরপর ঘরের পাশ থেকে একটা
আওয়াজ এল -- রাসূলুল্লাহর গায়ের কাপড় থাকা অবস্থাতেই তাকে গোসল দাও। কেউ জানে না এই কথা কে বলেছিল। তাই তারা রাসূলুল্লাহর জামার ওপর দিয়েই পানি
ঢালে এবং তারা তাদের হাত না দিয়ে জামার ওপর দিয়ে তাঁর শরীর ঘষে দেয়।গোসল শেষে রাসূলুল্লাহর শরীরে তিন টুকরো কাপড় জড়ানো হলো। রাসূলুল্লাহর
জানাযার সালাত এক জামাতে আদায় করা হয়নি। আইশার ঘরে যতটুকু
জায়গা হতো তত মানুষ আসতো, জানাযার সালাত আদায় করে চলে যেতো। এক
দলের সালাত আদায় শেষ হলে আরেক দল এভাবে সালাত আদায় করা হলো।
প্রথমে পুরুষরা, তারপর নারীরা, তারপর শিশুরা আর সবশেষে দাসরা। রাসূলুল্লাহর
সালাতে কোনো ইমাম ছিল না, প্রত্যেকে আলাদাভাবে সালাত আদায় করে।
--
রাসূলুল্লাহর শরীর ছিল আইশার ঘরে। উম্ম সালামা বলেন, 'আমরা
রাসূলুল্লাহর স্ত্রীরা খুব কাঁদছিলাম, কিন্তু তখন অতটুকু সান্ত্বনা ছিল যে আমরা

রাসূলুল্লাহর মৃতদেহটা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বুধবার গভীর রাতে যখন কবরের মাটি খোঁড়ার শব্দ পেলাম, তখন আমরা কান্নায় ভেঙে পড়ি, চিৎকার করে উঠি। মসজিদ থেকে আমাদের চিৎকার শুনতে পেয়ে তারাও চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, পুরো মদীনাই
যেন একটা বিরাট আর্তনাদে পরিণত হয়।' ফজরের সময় হলে প্রতিদিনের মতোই বিলাল আজান দিতে গেলেন। 'আল্লাহ
আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা 'ইল্লাল্লাহ।' এরপর আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলতে গিয়ে আর বলতে
পারলেন না, গলার কাছে আওয়াজগুলো যেন সব দলা পাকিয়ে গেল। কান্নায় ভেঙে পড়লেন বিলাল, আজান শেষ করতে পারলেন না। বিলাল ছিলেন আল্লাহর রাসুলের মুয়াজ্জিন, রাসূলের মৃত্যুর পর তিনি আর কারো জন্য আজান দেননি।
আইশার ঘরে খনন করা হলো রাসূলুল্লাহর কবর। নবীরা যে স্থানে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানেই তাঁদের কবর দেওয়া হয়, এটাই নবীদের সুন্নাহ। আইশা একটি স্বপ্নে দেখেছিলেন তিনটি চাঁদ তার কোলে পতিত হয়েছে। আবু বকর এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, 'যদি তোমার স্বপ্ন সত্যি হয়, তাহলে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ তিন ব্যক্তির কবর তোমার ঘরে হবে।' যখন রাসূলুল্লাহর দাফনের সময় এল তখন আবু বকর রাঃ বলেন, 'তোমার চাঁদগুলোর মধ্যে এটা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ চাঁদ।'
রাসূলুল্লাহ মৃতদেহ কবরস্থ করার সময় এল। এই কাজটিও রাসূলুল্লাহর পরিবারের লোকেরা সম্পন্ন করলেন। কবরে নেমেছিলেন আলী, ফাদল ইবন আব্বাস, কুসাম ইবন আব্বাস আর শুকরান । একটি বর্ণনা অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহকে কবরস্থ করার সময় মুগীরা ইবন শু'বা ইচ্ছে করে তার একটি আংটি কবরের মধ্যে ফেলে দেন এবং এরপর সবাইকে বলেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমার আংটিটা নিয়ে নিতে দিন।' এই বাহানায় তিনি রাসূল সাঃ এর কবরে নামেন যেন তিনি রাসূল সাঃ স্পর্শ করা শেষ ব্যক্তিটি হতে পারেন। এরপর তিনি উঠে আসেন। দাফনকাজ শেষ করে সবাই একে একে ফিরে এল। তখন ফাতিমা আনাসকে বললেন, 'আনাস, তোমরা কীভাবে পারলে আল্লাহর রাসূলের শরীরের ওপর মাটি নিক্ষেপ করতে।' আসলে রাসূলুল্লাহর মৃত্যু, তাঁর গোসল, তাঁর দাফন -- সবই
তাদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল। সেজন্য রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'যখনই তোমাদের কারো উপর কোনো বিপদ আসবে, তখন আমার মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে।' কারণ, একজন মুসলিমের ওপর সবচেয়ে বড় যে বিপদ আসতে পারে, সেটা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে আর তা হলো আল্লাহর রাসূলের জীবনাবসান। আর কোনো মুসিবতই এর সাথে তুলনা করার মতো নয়। আনাস ইবন মালিক ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ঘরে বড় হওয়া সাহাবি। তিনি বলেন,

'আমার জীবনের সবচেয়ে বিশেষ দিন দুইটা -- একটা সবচেয়ে আনন্দের, আরেকটা সবচেয়ে কষ্টের। আনন্দের দিনটি হলো রাসূলুল্লাহর মদীনায় আসার দিন। সেদিন সবকিছু ছিল আলোকিত। আর সবচেয়ে কষ্টের দিন হলো রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর দিন। সেদিন সবকিছু যেন আঁধারে ছেয়ে গেল। রাসূলুল্লাহকে কবর দেওয়ার পর যখন আমরা হাত থেকে ধুলো ঝাড়ছিলাম, তখন থেকেই মনে হতে লাগলো, আমাদের অন্তরগুলো আর আগের মতো নেই।'।
রাসূলুল্লাহ মারা যান হিজরী একাদশ বছরের বারো রবিউল আউয়াল। মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ ছিলেন সমগ্র আরবের অবিসংবাদিত শাসক। তিনি এমন একটা সময়ে চলে যান যখন অনারবের রাজা-বাদশাহরা তাঁকে সমীহ করতে শুরু করেছে। কিন্তু এই প্রতাপ আর প্রতিপত্তি থাকা মানুষটি কোনো সম্পদ রেখে যাননি। মৃত্যুর একদিন আগে তিনি সব দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেন। সাত দিনার ছিল, সেগুলোও সাদাকা করে দেন। তাঁর একটি বর্ম এক ইহুদির কাছে বন্ধক রাখা ছিল। সেটার বিনিময়ে তিনি কিছু যব নিয়েছিলেন পরিবারের জন্য। তিনি রেখে গেছেন কেবল একটি সাদা খচ্চর, কিছু অস্ত্র আর এক টুকরো জমি। এই জমিটিও তিনি মুসাফিরদের জন্য সাদাকাহ করে দিয়ে গেছেন। না ছিল সম্পদের বাহার, না ছিল সোনা-রুপার বহর, কিছুই না।

তবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এই মানুষটি রেখে গেছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। সেই প্রজন্ম গড়েছে এক নতুন ইতিহাস। মুসলিম জাতির আগে দুনিয়ার বুকে আল্লাহর মনোনিত জাতি ছিল বনী ইসরাঈল। তাদেরকে সৎপথে টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ তাদের কাছে একের পর এক নবী পাঠাতেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল যে উম্মাহকে রেখে গেছেন, সে উম্মাহর জন্য আর কোনো নবী পাঠানোর প্রয়োজন নেই, শেষ নবীই তাদের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত যথেষ্ট। এটা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অভাবনীয় সম্মাননা।

তথ্যসূত্র
~আর রাহীকুল মাখতুম
লেখক: সফিউর রহমান মোবারকপুরী
~সীরাতে ইবনে হিশাম
লেখক:ইবনে ইশাম (অনুবাদ:আকরাম ফারুক)
~ সীরাহ মুহাম্মদﷺ (রেইন ড্রপস মিডিয়া)
~ সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া
লেখক:মুফতি মুহাম্মদ শফি(র.)

~ নবীয়ে রহমত

লেখক: সইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)

~ মহানবী

লেখক : মাজিদা রিফা

~ মা আল মুস্তফা

লেখক: ড. সালমান আল আওদাহ

~ যেমন ছিলেন তিনি

লেখক: শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল- মুনাজ্জিদ

~ মহানবীর (সা)সীরাত কোষ

লেখক: খান মেসলেহউদ্দিন আহমেদ

~ IOM সীরাহ নোট

~https://www.quraanshareef.org/

~ মাসিক আল কাউসার